Vol. 31 | No. 2 | 1988

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আরবী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার ধারা

Volume	31
Issue	2
Year	1988
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ আবু বকর সিদ্দীক
Published online	February 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v31i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i2.3
Pages	103-140
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আরবী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার ধারা

মোঃ আবু বকর সিদ্দীক

সাহিত্য সমালোচনা (আল-নাক্দ আল-আদাবী) সাহিত্যেরই নিজস্ব একটি কর্ম যা পরিবেশ এবং সাহিত্যিকের স্বীয় প্রাকৃতিক সৃষ্টি বই আর কিছুই নয়। আল-নক্দ অর্থাৎ সমালোচনা এবং আল-আদাবী (সাহিত্য বিষয়ক) বলতে সাহিত্যকেই (আদব) বুঝায়। অনুপম রচনা-শৈলী এবং শব্দের দ্বারা একটি জীবনের পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক ব্যাখ্যা হলো সাহিত্যের সুপরিচিত সংজ্ঞা। সমালোচনায় সাধারণতঃ দোষ-ত্রুটির উল্লেখ থাকে। ব্যাপক অর্থে সমালোচনার সংজ্ঞা তখনই নিরূপণ করা যায় যখন কোন কিছুর মূল্যায়ন এবং তার বিচার দোষ-গুণ সহকারে হয়ে থাকে। কিন্তু আরবী পদ্য বা গদ্য সাহিত্যের সমালোচনা হলো সাহিত্য বিষয়ক গুণাবলীর ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং সাহিত্যের মূল বিষয়ের মধ্যে তাত্ত্বিক কিংবা ব্যবহারিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে তুলনা করা। বর্তমানে আরব সমালোচকগণ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যকে নিম্নমানের সাহিত্য থেকে পৃথক করার জন্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার ধারাকে ব্যবহার করছেন। আর তাই সাহিত্য সমালোচনার কাজ হচ্ছে সাহিত্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করা; সাহিত্যের তন্ময় (বস্তুনিষ্ঠ) এবং মন্ময় (অন্তর্মুখী) গুণাবলীর বর্ণনা করা, এর স্থান ও কাল সম্পর্কে দৃঢ়তা জ্ঞাপন করা; ভাষা ও সাহিত্য হিসেবে আরবীর প্রতি এর অবদান কতটুকু তা পর্যালোচনা করা, লেখকের আবেগ, অভিব্যক্তি এবং মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য চিত্রিত করা; পরিশেষে, সকল বাহ্যিক এবং প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানসমূহের প্রভূত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।[১]

পক্ষান্তরে আরবী এক সমৃদ্ধশালী সাহিত্য হিসেবে সারা বিশ্বে জুড়ে আছে। আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পনের শতাব্দীরও পূর্বেকার ইতিহাস এবং তা পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিশীল সাহিত্যে যুগ যুগ ধরে বহু

মূল্যবান অবদান রেখেছে। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে আরবী প্রতিশব্দ হলো 'আদব' এবং এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো আদব-কায়দা ও আচার-আচরণ। প্রাচীন আরবী সাহিত্যে একধরনের রাজকীয় বা সম্পাদকীয় সাহিত্য ছিল যা প্রশাসক, রাজপুত্র, এবং অনুরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হতো। এই রীতি-নীতি বিভিন্ন সাহিত্যিক ভঙ্গিমায় লিখিত হতো বলে কবিতা, উপাখ্যান ও ধর্মীয় পুস্তকে প্রভাব বিস্তার করতো। এই প্রকার সৃষ্টকর্ম তখন থেকে আদবের অন্তর্ভুক্ত হতো। পরবর্তীতে আদব শব্দটি এক বিশেষ অর্থে "সাহিত্য" বলে পরিগণিত হয় যা গদ্য ও পদ্য রচনায় সৃজনশীলতার ভাব প্রকাশ করতো। আবেগ, কল্পনা, চিন্তা ও রূপ— এই চারটি মৌলিক উপাদান সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষ প্রয়োজন। এ সব উপাদান ব্যতীত কোন সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্য সমালোচনা প্রাক্-ইসলামী যুগ থেকেই আরবদের নিকট পরিচিত ছিল যদিও তারা বিচার বিবেচনায় প্রবৃত্তি ও আবেগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তীকালে সাহিত্য সমালোচনার এসব পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতিসমূহ কতকগুলো নীতিমালা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাশ্চাত্যের সাথে সুপরিচিত সমালোচকগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান যুগে সেগুলো পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয়।[২]

অতঃপর সাহিত্য সমালোচনার উপর লিখিত বিদেশী পুস্তকের আরবী ভাষায় অনুবাদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আরব সমালোচকগণ অধীর আগ্রহ সহকারে সমালোচনার ধারা অধ্যয়ন করেন এবং আরবী সমালোচনা সাহিত্যকে এক বিশেষ সাহিত্য হিসেবে উন্নীত করেন। ফলে অলংকার শাস্ত্রের (বালাগতের) নিয়ম-কানুন এবং এই (অলংকার) শাস্ত্রের উন্নতিতে পবিত্র কুরআনের প্রভাব নতুন করে মূল্যায়ন করা হয়।[৩] এই আগ্রহ আরব পণ্ডিতদের বোধগম্যের পথ আরো সুগম করে দেয়। তাঁরা ইউরোপীয় সমালোচনার পদ্ধতির সাথে আরবী সমালোচনাকে তুলনা করে দেখলেন যে, বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য সমালোচনা অপেক্ষা তাঁদের নিজস্ব সমালোচনার রীতিনীতি অপর্যাপ্ত। আবার তাঁদের অনেকেই বলেছেন যে, আরবী অলংকার শাস্ত্রই আরবী ব্যাকরণের একটি উন্নীত পর্যায় যা সমালোচনার একটি পদ্ধতি বিবেচিত হওয়া ব্যতিরেকেই বিশুদ্ধ বর্ণনার শিক্ষা দিয়ে থাকে। তাই তাঁরা সাহিত্য

কর্ম মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে একটি নতুন ধরনের নিয়ম তৈরীর ও সমালোচনার পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে পুনরীক্ষণ করার ওকালতি করেন।[৪] আবার কোন কোন সমালোচক মন্তব্য করেন যে আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত অলংকার শাস্ত্রের নীতিমালাগুলো কোরআন ও হাদীসের দৈব শব্দ অধ্যয়নের আওতাভুক্ত ছিল। আর তাই অলংকার শাস্ত্রের এসব নীতিমালা সাহিত্য কর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যেই তৈরী হয়েছিল। পর্যায়ক্রমে এসব নীতিমালা একটি সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্য সমালোচনার বিধানরূপে পরিণত ও পরিগণিত হওয়া থেকে বিরত থাকে। আধুনিক যুগে আরবী অলংকার শাস্ত্রের সমালোচকগণ দুটি দলে বিভক্ত হয়েছেন। একদল পণ্ডিত বলেন যে, অলংকার শাস্ত্র কোন ক্রমেই একটি সমালোচনার বিজ্ঞান হতে পারে না, এতে বিষয় অপেক্ষা রচনাশৈলীর প্রাচুর্য বেশী। অন্যদল ধারণা করেন, অলংকার শাস্ত্রের প্রচলন অস্তিত্বের দিক থেকে সেকেলের রয়েছে। তাই আধুনিক সাহিত্যকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক মতবাদীদের আবার কেউ কেউ বলেন যে, অলংকার শাস্ত্র পদ্য এবং গদ্যের মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই যে মূলতঃ অস্তিত্বলাভ করেছিল তা প্রথম শ্রেণীর মতবাদীগণ এড়িয়ে গেছেন। অতঃপর পরবর্তী পণ্ডিতগণ তাঁদের পূর্বসূরীদের সমালোচনামূলক বিবরণ সংগ্রহ করে সেগুলো ভালরূপে বিচার বিশ্লেষণ করেন এবং সেগুলোকে স্বতন্ত্র ও সম্মিলিত সমালোচনার রুচি হিসেবে একটি ফরমুলা আকারে গ্রহণ করেন। এই নীতিমালাসমূহ পরবর্তীকালে পদ্য এবং গদ্যে ব্যবহৃত হয় এবং তার উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাই একথা বলা ঠিক নয় যে, অলংকার-শাস্ত্র আদৌ একটি সমালোচনার বিজ্ঞান নয়।[৫] আধুনিক যুগের অন্যান্য সমালোচকের মতে বালাগাত নামক আরবী বিজ্ঞান-শাস্ত্র প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচলিত স্বাতন্ত্র্যসূচক এবং বিভিন্ন বক্তব্যে শ্রেণীবিভক্ত ছিল, যা অদ্যাবধি একটি বিতর্কিত বিষয়।[৬]

আরবদের সমালোচনা সাহিত্যের একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে আরবী সাহিত্য সৃষ্টির কাল থেকে যার উৎপত্তি। প্রাচীনকালে গ্রীক জাতি সর্বপ্রথম সাহিত্য সমালোচনার ধারণা আবিষ্কার করে। যাযাবর জীবন তাদেরকে একটি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, তীক্ষ্ণ উপলব্ধি, সঠিক অনুভূতি এবং ভাষার সাবলীলতা উপহার দিয়েছে। তারা তাদের কবিদের

ভাষায় শব্দ, অর্থ, মাত্রা এবং প্রবন্ধ সম্পর্কিত অনেক তথ্যের উৎস এবং সৌন্দর্য দেখতে পায়। তাদের ছিল ধর্মান্ধ গোষ্ঠী ও গল্পকারবৃন্দ। ফলে কবিদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতা সর্বত্র বিরাজ করতে া। এসকল সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ সহজ-সরল সাহিত্যিক রুচিবোধের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতে সমালোচকদের জন্য সমালোচনার কোন নীতিমালা চিহ্নিত ছিল না। এরপর সোলোন[৭]-এর অনুপ্রেরণায় সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে প্রখ্যাত গ্রীক কবি হোমার কর্তৃক ইলিয়ড এবং অডিসি[৮] নামক দুটি মহাকাব্য রচিত হয়, যেহেতু গ্রীক সাহিত্যে কবিতা একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতো সেহেতু এ-সকল সাহিত্য সমালোচনার একটি বাহন হিসেবে চিহ্নিত হয়। কাব্যগুলোর মূল পাঠসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এবং স্বতন্ত্র, সামাজিক ও রসনেন্দ্রিয় অনুপ্রেরণায় যে মতপার্থক্য দেখা দেয় তা পরিহার করা হয়। এ সকল সাহিত্য প্রথম আত্মপ্রকাশ করলে এদের মূল পাঠসমূহে ত্রুটি দেখা দেয় এবং বর্ণনাকারীগণ কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এথেন্সে নাটকীয় কবিতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাহিত্য সমালোচনা ব্যাপক উন্নতিলাভ করে। সাহিত্য সমালোচনা জীবন সম্পর্কীয় একটি ব্যাখ্যা এবং জীবনের বিভিন্ন কার্যাবলীর মূল্যায়ন হিসেবে স্থান পেয়েছে বলে এটা কবিগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। এভাবে সমালোচনার ক্ষেত্র আরো অধিক প্রসারিত হয়। আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার মূল উপাদান হলো একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রণালী যা গ্রীক সম্রাট কর্তৃক কবিদের সৃষ্ট সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই প্রত্যেক কবি তার নিজস্ব লেখা বিচারকদের নিকট উপস্থাপন করত যারা সচরাচর মঞ্চস্থ করার জন্য একটি মনোরম নাটক নির্বাচন করত। এরপর দর্শকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ মতামত গৃহীত হতো এবং কিছু প্রভাবশালী উপাদান এই নাটক হতে গৃহীত হতো। মূলতঃ সাধারণ লোকের বিচার অপমানজনক এবং মর্যাদাহানিকর হয়ে থাকে। কারণ, সাধারণ লোক বিভিন্ন দলের ও মতের হয়ে থাকে এবং সমালোচনার সব উপাদান বজায় রাখতে তারা অপারগ। তাই তাদের বিচার সঠিক হতে পারে না। এমনি অবস্থায় সমালোচনার উপজীব্য রচনার প্রতি কবিদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তাই, দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে

রচনাবলীর বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও পদ্ধতি নির্বাচনে তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতা দেখা দেয়।[৯]

খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গ্রীকদের জীবন পদ্ধতির ধারা পরিবর্তিত হয়েছিল। দার্শনিক এবং কুতার্কিকদের অগ্রগতির সাথে সাথে উন্নততর মেধা সম্পন্ন জীবনও উন্নতি লাভ করেছিল। এরা তাদের বাগ্মিতা দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে কর্তৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। জনগণ বাগ্মিতার অর্থ এবং পদ্ধতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করত এবং বাগ্মিদের সাথে সম্পর্ক রাখত। শৈল্পিক নির্দেশনার বিষয়ে বলতে গেলে তাদের মধ্যে দক্ষ ও অভিনব চিত্র ও প্রতিকৃতি অংকন এবং সঙ্গীত চর্চার পরিচয় পাওয়া যেতো। এভাবে এথেন্সবাসীদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রীকদের মধ্যে পৌত্তলিকতার প্রতি সন্দেহ এবং নতুন নতুন মতবাদ ও চিন্তাধারা জন্মলাভ করে। অতঃপর নতুন এক বংশের আবির্ভাব হয় যারা তাদের পূর্ববর্তীদের মতামত অনুমোদন করতে পারেনি। এরপর সাহিত্যিকদের আধুনিক একটি দল বিয়োগান্তক (ট্রাজেডী) নাটকের ক্ষেত্রে অবির্ভূত হয় যারা পূর্ববর্তীদের মতামতের ধারায় নাটকের রচনাশৈলী, ভাব, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং আদর্শকে বোধগম্যের জন্য কিছু সমালোচনামূলক রচনা লিপিবদ্ধ করেন আব্বাসী যুগের প্রখ্যাত দার্শনিক কবি ও সাহিত্যিক আল-মাআর্‌রীর রচিত "রিসালাত আল-গুফরান" এর অনুরূপ এরিসটোফানিস অনেক আগেই "ব্যাঙের কাহিনী" (The story of the Frogs) নামক একটি নাটক খৃষ্টপূর্ব ৪০৬ সালে লেখেন। একই শতাব্দীতে প্রাচীন ও আধুনিক গ্রীক সাহিত্য সমালোচকদের পাশাপাশি এক ধরনের দার্শনিক সমালোচনাও দেখা যেত। গ্রীক এবং রোমান সাহিত্যিকগণ ঐ ধরনের সমালোচনার অনুসরণ করত যা প্রাচীন আরবী এবং আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। এই প্রকৃতির সমালোচকগণ তাঁদের সমালোচনায় ভাব, রূপ এবং বিষয়বস্তুর আলোচনাকে স্থান দিতেন। তাঁরা ইলিয়াড এবং অডিসিকে তাঁদের গবেষণার ও সমালোচনার বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে পেলেন।[১০] দার্শনিকগণ যেই দেখলেন যে মহাকবি হোমার এবং তাঁর সঙ্গীরা তাদের দেবতাকে পরস্পর বিরোধীগুণে অলংকৃত করছে, তখন তাদের একদল কবিতার সমালোচনা করে এবং তাকে অস্বীকার করে।

তাদের অপর দল কবিতার প্রতি অভিযোগ প্রতিহত করে এর রূপক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে কবিতা এক প্রকার কাল্পনিক চিত্র যা একজন উত্তম শিল্পীকে অবশ্যই বুঝতে হবে। এ সকল দার্শনিক বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ব্যবহৃত নন্দনতত্ত্বকে কখনও অস্বীকার করেন নি। ফলে নন্দনতত্ত্বের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়।[১১]

এ সকল দার্শনিক মাত্রার সমালোচনার প্রতিও মনোযোগ দেন এবং ভাব ও বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করেন। তাঁরা কবিতার ভাষাকে পৃথক করার জন্য ভাষাতত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং কবিতা ও কবিগণের ভাষার নতুনত্ব ও কর্মতৎপরতার মধ্যে পার্থক্য সূচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা এসব পর্যবেক্ষণ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এসব ভাষাতাত্ত্বিক ও দার্শনিকের একক ও যৌথ পর্যালোচনার ফলে মানব জাতির ইতিহাসে সর্ব প্রথম ভাষাবিজ্ঞান অস্তিত্ব লাভ করে। এরপর বাক্য এবং রচনাশৈলীর উপর ব্যাপক গবেষণার ফলে অলংকার শাস্ত্রের আবির্ভাব হয়। সমালোচনা সাহিত্যের অগ্রগতির সাথে সাথে গ্রীক সাম্রাজ্যের সর্বক্ষেত্রে রাজনীতিও উন্নতি লাভ করে যা জনগণকে তর্কবিদ্যার প্রতি উদাত্ত আহবান জানায়। আর তাই বিতর্ক ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বাগ্মিতাবিজ্ঞান অস্তিত্ব লাভ করে। ফলে গদ্য সাহিত্য সামাজিক উপকার ও শৈল্পিক বিশেষত্বে ব্যবহৃত হয়। প্রভাবশালী কুতার্কিকগণ বস্তুর বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এবং নিজ সম্প্রদায়কে আনন্দ ও আত্মতৃপ্তির প্রতি বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্নভাবে আহবান জানায়। এটা কবিতা এবং তার সমালোচনা অধ্যয়নের পাশাপাশি বাগ্মিতা ও তার সমালোচনা অধ্যয়নের এক ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।[১২]

খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর শেষে সক্রেটিসের আবির্ভাব হয়। তিনি প্রথমে কুতার্কিক বা অলংকার দর্শনের একজন শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি বাস্তবতত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি তাঁর শিক্ষকদের মতবাদকে খণ্ডন করেন এবং অলংকার শাস্ত্রের সংজ্ঞা দেন যে, এটা বস্তুর বাস্তবতা আবিষ্কারের একটি শিল্প স্বরূপ। তাই তিনি কথোপকথন মূলক রচনার উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করেন। The Theory of Resemblance in

Philosophy-র লেখক তাঁর ছাত্র ছিলেন, তিনি সক্রেটিসকে অনুসরণ করতেন, এবং বলতেন, "সাহিত্য অথবা ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক মতবাদ একটি শিল্প নয় যা কোন লোক ইচ্ছা করলেই সৃষ্টি করতে পারে ; বরং এটি একটি দৈবজ্ঞান এবং প্রত্যাদেশ : বিশুদ্ধ আত্মা বস্তুর সত্যতা উপলব্ধি করে এবং তা মানুষকে একটি কবিতা, প্রবন্ধ এবং দর্শন হিসেবে উপহার দিয়ে থাকে ; পরে ব্যক্তি বিশেষের ঐ প্রত্যাদেশে জনগণের নিকট প্রত্যর্পণ করার জন্য বাগ্মিতার প্রয়োজন হয়। প্লেটোর মতে দার্শনিক মতবাদ দুই প্রকার : একটি হলো প্রাকৃতিক, যাকে বিশুদ্ধ আত্মার একটি শক্তি হিসেবে ধরা যায় এবং যা তাকে প্রত্যাদেশ গ্রহণে সাহায্য করে। অপরটি হলো অর্জিত, যাকে একটি আলংকারিক শিল্প বলা চলে, যা শ্রোতা ও পাঠকদের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে বক্তাগণ কর্তৃক সৃষ্ট। প্লেটোর মতে সাহিত্য সমালোচনা হলো আত্মার প্রকৃতি, অবস্থা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে জানা এবং সাহিত্য সমালোচনা ও বাগ্মীপূর্ণ বক্তৃতার মধ্যকার সম্পর্কের জ্ঞানলাভ করা।[১৩]

খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক মহান এরিস্টটলের আগমন ঘটে। সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম সমালোচক বলে বিবেচিত হয়ে আছেন। তিনি সকল সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তী যুগের দার্শনিক, কবি, ভাষাতত্ত্ববিদ এবং সাহিত্যিক সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন এবং অলংকার ও সমালোচনার নীতির উপর সর্বাত্মক অথচ সর্বকালীন পুস্তক Poetica and Rhetorica (ফান্ন-আল-খিতাবা ওয়া আল-শি'র) লেখেন। এই মূল্যবান গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অলংকার শাস্ত্র ও সমালোচনা অধ্যয়নের তথ্যবহুল প্রথম উৎস হিসেবে বিবেচিত বলে পৃথিবীর সকল উচ্চতর ও উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়।[১৪]

সাহিত্য সমালোচনা মানুষের জীবনে একপ্রকার প্রাকৃতিক শিল্প, যদিও তাকে সামান্য কল্পনা এবং অনুভূতির শক্তি প্রদান করা হয়। এটি তাকে সাহিত্য এবং সাহিত্যিক রুচি বোধগম্যে সামর্থ্য দান করে এবং তাই সে এতে বিচারের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকে কার্যকর ও বিদ্যমান ছিল। প্রথম কবির আবির্ভাবের পর সম্ভবতঃ প্রথম সমালোচকের আবির্ভাব হয়। তার সমালোচনা কাব্যধর্মী রুচির সাথে সীমাবদ্ধ

নেতিবাচক ছিল, না হয় যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার সাথে প্রকাশ্যে উদাস ঘোষণাকে অতিক্রমশীল ইতিবাচক ছিল।[১৫] গ্রীক সমালোচনার সাথে সাথে আরবী সাহিত্য সমালোচনাও বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নতি লাভ করে এবং ঐতিহাসিক প্রত্যেক যুগেই আরবী সাহিত্যের সাথে পদচারণা করে। প্রাচীনকালে প্রাক ইসলামিক আরবী কবি সমালোচক ও বাগ্মী-গণের উপস্থিতিতে তায়েফ নগরীর নিকটে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উকায মেলা সহ আরবের বিভিন্ন বাজার ও মৌসুমী মেলায় সাহিত্য সমালো-চকগণ কর্তৃক পরিবেশিত মতামতসমূহের প্রতি আরবী সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। এ সকল মেলায় কবিগণ তাঁদের কবিতা উপস্থাপনের জন্য একত্রিত হতেন এবং বিচারক অথবা সমালোচকবৃন্দ নিরপেক্ষ নীতির দ্বারা এক বা একাধিক উৎকৃষ্ট কবিতা নির্বাচন করতেন। ১০টি মুআল্লাকাত সহ এসব কবিতা মক্কার পবিত্র কাবাগৃহে ঝুলিয়ে রাখা হতো, যদিও এ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। প্রখ্যাত কবি নাবিঘা (মৃ. আনু. ৬০৪ খ্রী.) ও আমর বিন-আল-শারিদের কন্যা আল-খানসা (জন্ম ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে) প্রসিদ্ধ সমালোচকও ছিলেন। প্রাক-ইসলামী যুগের সাহিত্য সমালোচনার উপাদানগুলো পরিমাণে অল্প ও খুবই দুর্বল ছিল।[১৬] এ যুগের কবিদের রচনায় তাদের ঐতিহাসিক এবং জীবনীসংক্রান্ত অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কারণ এদের কবিতা প্রকাশ্যভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তখন সমালোচনা করা হতো। এ ছাড়া আরবী সাহিত্য ঐ সকল সাধারণ লোকের সমালোচনামূলক বিবৃতিও সংরক্ষণ করেছে যারা কবিতার আবৃত্তি শ্রবণে প্রাক্-ইসলামী যুগের উপরোল্লিখিত বার্ষিক মেলা, বাজার এবং সভায় সমবেত হতো। উল্লেখ্য যে, ইমরু আল-কায়স ও আল-আলকামার মধ্যে পূর্বপ্রস্তুতিহীনভাবে কবিতার দ্বন্দ্ব হতো। একদা ইমরু আল-কায়স নিম্নোক্ত চরণটি আবৃত্তি করেন:[১৭]

فللسوط الهوب و الساق درة وللزجر منه وقع اخرج مهذب

অপরদিকে আল-আলকামা বলেন[১৮] :

فادركهن ثانيا من عنانه يمر كمر الرائح المتحلب

শ্লোকগুলো ইমরু আল-কায়সের স্ত্রীর মতামত যাচাই করার জন্য পেশ করা হলে তিনি তাঁর রায় আল কামার অনুকূলে প্রদান করেন।

কারণ, ইমরু আল-কায়স কর্তৃক ঘোড়ার বর্ণনা আলকামার বর্ণনার চেয়ে নিম্নতর ছিল। অবশ্য বর্ণনা, ভাব ও রচনাশৈলীর দিক থেকে উভয় কবি সমান গুণের অধিকারী ছিলেন। এমনিভাবে সমালোচকদের দৃষ্টিতে ইমরু আল-কায়সই গীতি কবিতায় রচনাশৈলীর মূল উদ্ভাবক ছিলেন এবং অনুপম বর্ণনা, উপমা এবং উৎপ্রেক্ষার মৌলিকতায় তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি প্রশংসিত হয়ে আছেন। একদিকে ইমরু আল-কায়স তাঁর সুরুচিপূর্ণ এবং মনোরম একটি কবিতার জন্য যেমন প্রশংসিত :

وماذرفت عيناك الالتضربى بسهميك فى اعشار قلب مقتل

"তোমার নয়ন যুগল দুটো তীর সদৃশ, আমার নিহত অন্তরের অন্তস্থলে চরম আঘাত হানার উদ্দেশ্যেই অশ্রুপ্রবাহিত করছে।"

অপরদিকে তিনি অন্য একটি কবিতার জন্যও তেমন সমালোচনার পাত্র হয়েছেন :

اذا ما الثريا فى السماء تعرضت تعرض اثناء الوشاح المفصل

"(সে তার প্রেমিকার নিকট গেল) যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল আকাশে স্ত্রীলোকের মুক্তা গাঁথা ফিতার ন্যায় দেখা দিল।

এখানে ইমরু আল-কায়স সমালোচিত হয়েছেন যে, মধ্যরাতের পর আকাশে মিথুন উদিত হয়, সপ্তর্ষি নয়। সমালোচনায় শুধু ভাষা এবং রচনাশৈলীই বিবেচ্যবিষয় নয় ; বরং কোন বিষয়ে কবির বাস্তবতা এবং সঠিক জ্ঞানের বিবেচনা করেও তাঁর কবিতার বিচার করা হয়। তাই প্রাক-ইসলামী যুগে সাহিত্য সমালোচনা শুধু প্রাকৃতিক রুচিবোধের উপর ভিত্তি করে কাব্যিক নিরীক্ষণের বর্ণনা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এই রুচিবোধ রাজদরবারে, শাসক ও দলপতিদের এবং মেলা, বাজার ও সভাসমিতিতে কবিদের পারস্পরিক স্বাভাবিক প্রতি-যোগিতার শক্তিতে বলীয়ান ছিল। বেদুইন গোত্রের কোন কবির মর্যাদা এবং গোত্রপ্রীতি কোন কবিতার প্রশংসা অথবা কবির উচ্চপ্রশংসা বা নিন্দার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। উত্তেজনা এবং প্ররোচনায় নির্ভরশীল হয়ে সাহিত্য সমালোচনা ভাষার শব্দ, অর্থ এবং ক্ষুদ্র বর্ণনাকে গ্রহণ করে এবং সমসাময়িক কবিদের মধ্যে তাঁর নিজস্ব কবিতার মান ও স্থান সুনিশ্চিত করে। এ সময় সমালোচকদের হাতে বিচার বিশ্লেষণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা ছিল না। কবিদের পক্ষাবলম্বন করে

বর্ণনাকারীগণ তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে সমালোচনামূলক চিন্তা ধারা সমূহ সংগ্রহ করত। কাব্যধর্মী দর্শন এবং সমালোচনামূলক ভাব ধারা লক্ষ্য করা যেতো জুহায়ের, নাবিঘা এবং আরো অন্যান্য প্রাক-ইসলামী কবি মধ্যে।[১৯] এ সকল সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণের অধিকাংশ সঠিক না হলেও বর্ণিত বিষয়গুলোর ভিত্তি সঠিক ছিল যা এ যুগের সমালোচনায় প্রাপ্ত সহজ সরল একটি সাহিত্য রুচির প্রতি ইঙ্গিত বহন করতো। এই রুচিবোধ কবিতানুসারী ছিল এবং কবিতা-রূপ সমালোচনা যুক্তি অপেক্ষা অধিক প্রত্যক্ষজ ছিল। একজন আরব কবি তাঁর আশেপাশের সংঘটিত প্রাকৃতিক ঘটনায় ভাবপ্রবণ হয়ে তাঁর আবেগ এবং কল্পনায় কবিতা রচনা করতেন, অথচ একজন আরব সমালোচক এ সকল রচনায় নিজস্ব আবেগ এবং কল্পনার প্রতি মনোনিবেশ করতেন। একজন প্রকৃত বেদুইন কবি আবেগে অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা রচনা করতেন, এবং একজন সমালোচক তাঁর কল্পনায় প্রভাবিত হয়ে সমালোচনা করতেন। অনুরূপ বিষয় ঘটে থাকে তাঁর সাহিত্য ও সমালোচনায়।[২০]

আরবী সাহিত্য সমালোচনার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে এবং পবিত্র কুরআনের প্রত্যাদেশ সাহিত্যের প্রচলিত ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ছিল। পবিত্র কুরআন কবিতা ও ছিল না আবার খাঁটি গদ্যও ছিল না। পবিত্র কুরআন আরবী ভাষা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্ধারণ করে এবং পরবর্তীতে আরবী সাহিত্য সমালোচনার উন্নতি ও কলেবর বৃদ্ধি করে। কিছু কবি লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানায়, অপরদিকে কিছু কবি কাব্যিক প্রতিভাকে ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়োগ করে। নবী (সঃ) এবং তাঁর খলিফাগণ ঐসব কবিতা পছন্দ করতেন, যেগুলো লোকদেরকে উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠনে ইসলামী জীবনের মূল্যবোধের শিক্ষা দিত। দ্বিতীয় খলিফা উমর বিন আল-খাত্তাব (রাঃ) প্রাচীন এবং সমসাময়িক সাহিত্যের নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ এবং ভূয়সী প্রশংসার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। একদা তিনি প্রাক্-ইসলামী কবি আল-নাবিঘা সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন[২১] :

> "জাহিলী কবিদের মধ্যে তিনি (নাবিঘা) ছিলেন শ্রেষ্ঠ, কারণ, তিনি কখনো অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার করতেন না। তিনি

> সর্বদা অদ্ভুত এবং অপরিচিত শব্দ কবিতায় ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতেন এবং কোন লোকের গুণ ছাড়া তাকে প্রশংসা করতেন না।"

খলিফা উমর বিন আল-খাত্তাব (রাঃ) যুহায়র বিন আবি সুলমা (মৃ. ১০/৬৩১) সম্পর্কেও মন্তব্য করেন যে, সে কোন বিষয়কে পুনরাবৃত্তি করত না, অথবা সে অপরিচিত ও অদ্ভুত বর্ণনা দিত না অথবা কোন লোকের মধ্যে যে গুণ পাওয়া যেত না তার প্রশংসা করত না[২২]:

وكان لا يعاضل بين القول ولا يتبع حوشى الكلام و يمدح الرجل الا بما هو فيه -

নাবিঘা এবং যুহায়র সম্পর্কে খলিফার ইতিবাচক সমালোচনা সম্ভবতঃ একটি দৃষ্টান্ত হয়েছিল যা তিনি সাহিত্য বিষয়ক ব্যাখ্যা এবং সমালোচনামূলক বিচারের ভিত্তিতে করেছিলেন। এমনিভাবে সমালোচক কর্তৃক নাবিঘা জা'দীর কবিতায় মত প্রকাশ করা হয় যে, তা ছিল উচ্চ এবং নিম্নগুণের মিশ্রণ, যা ইতিবাচক সমালোচনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। অতঃপর ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং কাব্যিক পারিপার্শ্বিকতার সাথে কবিতাও পুনরায় উন্নতি লাভ করে। প্রাক্-ইসলামী বংশ গৌরব এবং গোত্রপ্রীতি পুনর্জাগরিত হয়। তাই সাহিত্য সমালোচনা কবিতার সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তা বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন দলের কবিদের তুলনামূলক পর্যালোচনাকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

আরবী সাহিত্য সমালোচনার তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে, ১ম-৭ম শতাব্দীর উমাইয়া যুগ পর্যন্ত, যা ইসলামী জগতে দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। তখন ব্যাকরণ, দর্শন এবং ভাষা বিষয়ক বিভিন্ন বিজ্ঞানের গবেষণা এবং আরবী সাহিত্যের স্বার্থ বৃদ্ধি পায়। এ যুগে আরবী পদ্য ও গদ্য সাহিত্য প্রচুর উন্নতি লাভ করে এবং উর্বরা ভূমির ন্যায় সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে। উমাইয়া খলীফা এবং শাসকদের দরবারে এর সার্বিক উন্নতির জন্য উৎসাহ প্রদান করা হতো। এ সময় উমাইয়া সাহিত্যে জীবনের বিভিন্ন দিকগুলো ফুটে উঠতো। কবিতায় প্রতিফলিত হতো রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, যুদ্ধ, বিচারালয় এবং ইসলামী জগতের ব্যাপক

প্রসারতার কথা।[২৩] উমাইয়া যুগে আবির্ভূত হয়েছে নাকাইদ (বিতর্ক-মূলক কবিতা)-এর প্রভাবশালী কবিগণ, যেমন, জারীর (মৃ. ১১০/৭২৮), ফারাযদাক (মৃ. ১১০/৭২৮) এবং আখতাল (মৃ. ৯৫/৭১৩); এঁরা নিজ নিজ সমর্থকদের নিয়ে কয়েক বৎসর পর্যন্ত বসরার উপকণ্ঠে আল-মিরবাদে পরস্পরের সাথে ঠাণ্ডা যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং তা তাঁদের কবিতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, এর কিছু কিছু অদ্যাবধি বর্তমান আছে।[২৪] যখন জারীর কাসীদা-ই-আইনিয়্যা জনৈক উমাইয়া খলীফার নামে পাঠ করতে করতে নিম্নোক্ত চরণে আসেন:[২৫]

وتقول بوزع قد دببت على العصا هلا هزئت بغيرنا يا بوزع

তখন খলীফা মন্তব্য করেন যে, সে তার কবিতায় পুরাতন নামটি সংযুক্ত করে তার সুন্দর চরণটি বিনষ্ট করে দিয়েছে। অন্য এক প্রসঙ্গে আখতালকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে জারীর এবং ফারাযদাকের মধ্যে কে ভাল, সে তখন উত্তরে বলল যে, ফারাযদাক পাথর কর্তন করে এবং কবি জারীর অঞ্জলি পুরে সমুদ্রের পানি উত্তোলন করে। আখতালের এই সিদ্ধান্তবিহীন ঘোরালো উত্তরটি জারীর বিরূপ সমালোচনা বলে ধরে নিলেন এবং মদ্যপের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় বলে আখতালের সমালোচনা করলেন। জারীরকে যখন আখতাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বললেন যে, আখতাল রাজাদের প্রশংসায় এবং মদের বর্ণনায় দক্ষ। প্রাক-ইসলামী সমালোচনার ন্যায় উমাইয়া সমালোচনা সাহিত্য-রুচি ও সাহিত্যিকদের স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। সাহিত্য সমালোচনা একাধারে জারীর, ফারাযদাক, আল-আখতাল, যুআল-রুম্ম,া জামীল, কুছাইর, নুসাইব, উমর বিন-আবী-রাবী'আ এবং শহর ও মরুবাসী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কবিদের কবিতায় অনুশীলন করা হয়েছে। এই শিল্পনৈপুণ্য সমালোচনার পাশা-পাশি উমাইয়া যুগের ব্যাকরণবিদ এবং ভাষাতত্ত্ববিদ কর্তৃক বসরা এবং কুফায় এক ধরনের ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কীয় সমালোচনা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাঁরা ভাষা, ব্যাকরণের রীতি-নীতি, ভাষাতত্ত্ব ও ছন্দশাস্ত্রের সাথে সমালোচনার নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের সমালোচনাও সুরুচি সম্পন্ন ছিল।[২৬] এ যুগের সাহিত্য এবং সমালোচনা হিজাজ, ইরাক এবং সিরিয়ার তিনটি পরিবেশে সামাজিক অবস্থা এবং প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে এক বিশেষ রঙে রঙিন

করে দেখানো হয়েছে। তবে পারস্য, মিসর এবং মাগরিবে (উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায়) তা হয়নি।[২৭] এ যুগে সাহিত্য সমালোচনা একজন কবিকে অন্য একজন কবির উপর প্রাধান্য দেয়ার মধ্যে আবর্তিত ছিল। একজন কবি অন্য একজন কবিকে পক্ষপাত দেখানোর মধ্যে, শব্দ চয়নের এবং উত্তমরূপ কিংবা এর সুনাম হানিকর বিষয় ইত্যাদি নির্বাচনের মধ্যে সাহিত্যের সমালোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। এ সকল বিষয় স্বাভাবিক রুচির উপর নির্ভরশীল, পরিবেশ দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং সংস্কৃতির প্রভাবে উন্নতমানের হয়েছিল। প্রাকৃতিক একটি বস্তু হিসেবে সাহিত্যের প্রকাশ ঘটে প্রকৃতি এবং সহজাত প্রবৃত্তি থেকে এবং একইভাবে সমালোচনার জন্ম হয় রুচি, প্রবৃত্তি এবং প্রকৃতি থেকে। সুতরাং সাহিত্য এবং সমালোচনা উভয়েরই একে অপরের সাথে মিল ছিল। উমাইয়া যুগের শেষে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কিছু ব্যাকরণবিদ তাঁদের গঠন পদ্ধতি ও রচনাশৈলী অনুসারে কবিতার সমালোচনা করতে থাকেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, একজন কবি তাঁর কবিতা গঠনের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত নিয়ম ভুল করে থাকেন এবং ধাতুগত ও রূপগত পদ্ধতিকে (যেমন বিভক্তি ও প্রত্যয়) অনুসরণ করেননি। এটা একপ্রকার নতুন সমালোচনা ছিল।[২৮] কবি আলী বিন যায়েদ সাধারণ লোকের সংস্পর্শে এবং শহুরে জীবনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, আর তাই তাঁর সমালোচনা এবং ভাষাতাত্ত্বিক বাগ্মিতা কাব্যপ্রবণ ছিল। অপরদিকে ইব্‌ন কায়স আল-রুকায়্যাত বাগ্মীও ছিলেন না এবং বিশ্বাসযোগ্যও ছিলেন না, কারণ, তিনি হিজাজের তাকরিত শহরে মদ্যপানে ব্যস্ত থাকতেন। প্রাক-ইসলামী যুগের কবি হাস্‌সান বিন্‌ ছাবিত (মৃ. ৫৪/৬৭৪) এর কবিতায় আল-আসমাই নিছক কল্পনা ও অসৎ নকশার উপর নির্ভরশীল কিছু জোরালো দিক দেখতে পান। কিন্তু ইসলামী যুগে তিনি তাঁর কবিতার কিছু দুর্বল দিকও দেখতে পান। তাই আল-আসমাইর মতে কবিতা হচ্ছে সামাজিক-জীবনের প্রতিধ্বনি। এ কারণে ইবনে সাল্লাম আল-জুমাহী (মৃ. ২৩১/৮৪৫) প্রকৃত কবি এবং তার কবিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতেন।[২৯] সমালাচকগণ নিজেরা কবি ছিলেন না। এ-যুগে হিজাজের ইব্‌ন আবি আতীক এবং সুকাইনা প্রখ্যাত সমালোচক ছিলেন। তাই, প্রেমমূলক কবিতা হিজাজের সাহিত্যে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয় এবং সমালোচনাও সেইভাবেই তাকে অনুকরণ করতে থাকে।

ইরাকী সাহিত্যে মূল্যহীন গৌরব গাঁথা (আল-ফাখ্‌র) এবং নিন্দামূলক (আল-হিজা) কবিতা বিস্তার লাভ করে এবং সমালোচনাও সে ভাবেই একে অনুসরণ করে সৃষ্টি হয়। সিরিয়ার সাহিত্যে প্রশংসামূলক কবিতা ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং তাও সমালোচনার অনুসরণীয় হয়। আর এটা প্রাকৃতিক বিস্ময়কর একটি বস্তু।[৩০]

আরবী সাহিত্য সমালোচনার ৪র্থ স্তর শুরু হয় আব্বাসী যুগের সূচনাকাল থেকে ২য়/৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। এসময় থেকে ব্যাকরণবিদ এবং ভাষাতত্ত্ববিদগণ প্রাক-ইসলামী ও ইসলামের সূচনা যুগের মৌখিক কবিতাসমূহ সংরক্ষণ করতে থাকে। তাঁরা প্রাচীন সাহিত্য সমালোচক এবং তাঁদের সমালোচকদের সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য সমূহও সংগ্রহ করেন। এ সকল পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন আবু আমর বিন-'আলা, ইউনুস বিন্ হাবীব, আল-আসমাই এবং ইব্‌ন সাল্লাম আল-জুমাহী। ইব্‌ন সাল্লাম তাবাকাত ফুহুল আল-শু'আরা (মহাকবিদের শ্রেণী বিভাগ) নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকটি তাঁর যুগের সাহিত্য সমালোচনার সর্বপ্রথম এবং সমালোচনা-মূলক মন্তব্যের একটি আদর্শ ও প্রতিনিধিত্বশীল পুস্তক হিসেবে বিবেচিত। প্রত্যেক সমালোচকের যে সব গুণ থাকা আবশ্যক তাঁর মধ্যে সে সব গুণ বিদ্যমান ছিল এবং যে সকল নীতির উপর ভিত্তি করে সমালোচনা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক তিনি সে সব নীতিমালা রচনা করেছেন। তাঁর মতে সমালোচনা শুধু সাহিত্যিক রুচির জন্যই হওয়া উচিত নহে। এতে প্রয়োজন দীর্ঘ প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা, এবং একজন সমালোচকের উচিত তাঁর সমালোচনা শিল্পের চর্চা করে একজন দক্ষ ও নিপুণ সমালোচক হওয়া। ৩য়/৯ম শতাব্দীর বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক হচ্ছেন আল-জাহিয, ইব্‌ন কুতাইবা এবং ইব্‌ন আল-মু'তাজ্জ।[৩১] আল-জাহিযের "আল-বায়ান ওয়া আল-তাবয়ীন" নামক পুস্তকে প্রাক্-ইসলামী যুগ থেকে ২য়/৮ম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের সাহিত্য সমালোচনার বিষয় আলোচিত হয়। তিনি জনসাধারণের বক্তৃতার দোষগুণ সম্পর্কে অনেক নিরীক্ষণ ও মন্তব্য করেন। এগুলো নিম্নোক্ত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়:[৩২]

(১) উচ্চারণের বিশুদ্ধতা এবং বাচনভঙ্গির ত্রুটিসমূহ এবং তার কারণসমূহ।

২. উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত ভাষা ও তার উপাদানসমূহ।
৩. পদবিন্যাস প্রক্রিয়া এবং শব্দ ও তার অর্থের মধ্যে সম্পর্ক।
৪. বক্তার যথাযথ বাহ্যিক রূপ এবং তার ইচ্ছাজ্ঞাপক যথাযথ সঙ্কেত ব্যবহার।

ইব্‌ন কুতাইবা আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা (আরবী কবিতা এবং কবি) গ্রন্থে সমালোচনার রাজ্যে দার্শনিকদের অভিগমন এবং বিচার বিশ্লেষণে যুক্তিবিদ্যা সম্মত তাঁদের অনমনীয় পদ্ধতি ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি সমালোচকদেরকে নিরপেক্ষ বিচারের প্রতি এবং তাদের নিজস্ব মূল্যায়ন শক্তি প্রয়োগের প্রতি আহবান জানান। রাজপুত্র ও কবি ইব্‌ন আল-মু'তাজ্জ আল-বাদী' (মনোরম রীতি) নামক পুস্তক রচনা করেন। এতে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক পন্থীদের মধ্যে বিতর্ক সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি নিম্নোক্ত বিষয়ের উপরও পর্যালোচনা করেন:[৩৩]

১. কবিতার জন্য রূপকালঙ্কার (ইসতি'আরা) একান্ত প্রয়োজন।
২. কবিতায় রীতিগত ও প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আবশ্যক, যেমন স্বরসাদৃশ্য বা শ্লেষালংকার (তাজনিস) এবং বিরোধালঙ্কার (মুতাবাক, তিবাক)।
৩. কবিতার উপর যুক্তিসঙ্গত বিতর্ক অথবা পর্যালোচনা।

৩য় হিজরীর শেষে/খ্রী. ১০ম শতাব্দীর প্রথমে কুদামা বিন্ জাফর নতুন এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের সান্নিধ্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নাক্‌দ আল-শি'র (কাব্য সমালোচনা) নামক একখানা পুস্তক রচনা করেন এবং সচিব আবুল হুসাইন ইসহাক বিন্ ইব্রাহীম নাক্‌দ আল-নাছর (গদ্য সমালোচনা) লিখেন।[৩৪] কুদামা তার নাক্‌দ আল-শি'র-এ কবিতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন যে "মাত্রা, মিল এবং অর্থপূর্ণ সচরাচর কথাই হচ্ছে কবিতা।" তিনি আরও বলেন যে, "কবিতার মূল উপাদান হচ্ছে: শব্দ, মাত্রা, মিল এবং ভাব"। এ সকল পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সাধারণ উপাদানসমূহকে তিন চারটি যৌগিক উপাদানে বিভক্ত করেন: [৩৫]

১. শব্দ এবং ভাবের যথোপযোগিতা।
২. শব্দ এবং মাত্রার যথোপযোগিতা।

৩. ভাব এবং মাত্রার যথোপযোগিতা।

৪. ভাব এবং মিলের যথোপযোগিতা।

কুদামা তাঁর নিয়মতান্ত্রিক বিশ্লেষণে নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিও ব্যবহার করেছেন।

৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে বেশ কিছু সংখ্যক সমালোচকের আবির্ভাব হয়, যেমন, আল-আমিদী, আল-জুরজানী, আবুল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, আবু হিলাল আল-আসকারী, আল-বাকিল্লানী এবং আল-সা'আলিবী, এরা পদ্ধতিগত সাহিত্য সমালোচনার প্রথম ব্যাখ্যাকার বা প্রতিনিধি বলে পরিচিত। আল-আমিদী "আবু তাম্মাম ও বুহতুরীর ভাব ও রচনাশৈলীর মধ্যে তুলনা করে আল-মুআয়ানা নামক একখানি গ্রন্থ লিখেন, এই দুই কবিই কাব্যশিল্পের দুটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন। আল-আমিদী তাঁর পদ্ধতিগত সমালোচনায় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নির্ভেজাল আরবী রুচিশীলতার উপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি সাহিত্যের মূল পাঠ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে বাস্তবমুখী আবশ্যিক পন্থা-গুলোর উপরও নির্ভরশীল ছিলেন। সনাতন মডেল, আরবী কবিতায় তাঁর ব্যাপক জ্ঞান এবং সাহিত্য রুচির উৎকর্ষতা তাঁর পরিচালিত তুলনার মানদণ্ড ছিল।[৩৬] কাজী আবদুল আজীজ আল-জুরজানী 'আল-ওয়াসাতা বাইনা আল-মুতানাব্বী ওয়া খুসুমিহি (কবি আল মুতানাব্বী এবং তাঁর প্রতিপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা) নামক পুস্তকে মুতানাব্বী এবং তাঁর কবিতার অভিযোগ প্রতিহত করেন। তাঁর সমালোচনার ধরন ছিল অন্য কবিদের দোষ বর্ণনার সাথে সাথে কবিতার সূক্ষ্ম প্রশংসা ব্যতীত তাঁর প্রিয় কবির গুণ তুলনা করা। তাঁর সততা, নিরপেক্ষতা এবং নির্দোষ বিচার তাঁর গ্রন্থের মান আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুণাগুণ স্থান পেয়েছে। 'ওয়াছাতাতে' তিনি যে ভূমিকা লিখেছেন তাতে সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব স্থান পেয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো তার কৌতুকপূর্ণ প্রায় আধু-নিক কাব্যিক ক্ষমতার বিশ্লেষণ যার পাঁচটি উপাদান হলো: প্রাকৃতিক প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা, শিল্পের সাথে পরিচিতি, অতীত মডেলকে স্মৃতিতে আবদ্ধ করা এবং বাস্তব প্রশিক্ষণ। সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপাদান হিসেবে এ সকল কারণ তিনি পুস্তকে বজায় রেখেছেন। এগুলো এক নির্দিষ্ট কাল বা বংশের আওতায় সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সকল যুগের মনুষ্য

জাতির জন্য প্রযোজ্য ছিল।[৩৭] আল-আমিদী এবং আল-জুরজানীর দু'টি বই আরবী ব্যবহারিক সমালোচনার ক্ষেত্রে শীর্ষ স্থানীয় বলে ধরা হয় এবং সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন আরবদের এক সুচিন্তিত প্রচেষ্টা বলে মনে করা হয়।

আবু আল-ফারাজ আল-ইস্ফাহানী ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে "কিতাব আল-আঘানী" (গানের বই) নামক ২০-এরও অধিক খণ্ডে একখানা সাহিত্য বিশ্বকোষ লেখেন। মূলতঃ ইসলামের প্রথম যুগের গান ও সঙ্গীত নিয়ে রচিত হয় এই সঙ্গীত এবং গীতি কাব্য। প্রতিটি কবিতা অথবা সঙ্গীতের পাশাপাশি আল ইস্ফাহানী বেশ কিছু সংখ্যক আরবী কবি এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিস্তারিত জীবনী ও সমালোচনামূলক তথ্য সরবরাহ করেছেন।[৩৮] আল-আসকারী তাঁর "আল-সিনাতাইন" (পদ্য ও গদ্য নামক দু'টি শিল্প) গ্রন্থে প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার একটি ধারা-বাহিক এবং বিস্তারিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সুযোগ পান। কুদামার ন্যায় তিনি একটি ধারাবাহিক অনমনীয় পদ্ধতি এবং একটি শিক্ষা-মূলক পথ অনুসরণ করেন যার সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাগ কৌতূহল-পূর্ণ বলে মনে হয়।[৩৯] তিনি কাব্যিক চৌর্যে (সিরকা) সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিলেন, যখন তিনি মনের ভাব ব্যক্ত করেন:[৪০]

> বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের নিকট কবিতার অর্থ একই। সাধারণ নাবাতিয়ান এবং নিগ্রোদের নিকট ভাল অর্থ অমার্জিত হতে পারে। তাদের মধ্যকার পার্থক্য এবং মনোনয়ন কাব্যিক ব্যাখ্যাও রূপের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

এ সব সমালোচকদের সমসাময়িক আল-বাকিল্লানী (মৃ. ৪০৪/১০১৩) ই'জাযুল-কুরআন (কুরআনের আলংকারিক অসাধারণত্ব) নামক একটি পুস্তক রচনা করেন, যা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম বলে বিবেচিত। এই গ্রন্থে কুরআনের রচনাশৈলী ও সাহিত্য-রীতির কিছু গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করার মাধ্যমে সমালোচনামূলক ধারণার অবতারণ করা হয়েছে। বাকিল্লানীর মতে কুরআনের রচনা-শৈলীর অনুপমত্ব তার ধর্মতাত্ত্বিক অনুপমত্বের স্বপক্ষে কোন যুক্তি নয়। কোন মানুষের পক্ষে কুরআনের অনুপম ভাষা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তিনি কুরআন ছাড়া আর সমস্ত আরবী সাহিত্যকে কুরআনের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের বলে প্রতিপন্ন করবার জোর প্রচেষ্টা করেছেন।

সাআলিবী (মৃ. ৪২৯/১০৩৮) ৪র্থ/১০ম এবং ৫ম/১১শ শতাব্দীর একজন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক ছিলেন। যদিও সিরর আল সিনাআর ন্যায় সাহিত্য সমালোচনার উপর তাঁর লিখিত কিছু বই হারিয়ে গেছে তবুও বইটির সামান্য মূল পাঠ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ণাঙ্গ বইটি যদি ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেতো তা হলে এটা আমাদেরকে সাআলিবীর অন্যান্য পুস্তকের একটি সমালোচনামূলক আস্বাদ ও পর্যবেক্ষণের ধারণা দিত। তাঁর ইয়াতীমাত আল্-দহর এবং তাতিম্মাত আল-ইয়াতীমা নামক বই দু'টি সাহিত্যের ইতিহাস নয় আবার কাব্যের ইতিহাসও নয়, অথবা এরা কবি ও সাহিত্যিকদের জীবনীমূলক পুস্তকের আওতায়ও পড়ে না। এগুলো শুধুমাত্র সাহিত্য সমালোচনারই বই। সাআলিবী এই পুস্তক দু'টিতে পারিপার্শ্বিকতার নীতি এবং শৈল্পিক রীতির উপর ভিত্তি করে তাঁর সমালোচনামূলক বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন এবং তিনিই আরবী সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে সর্বপ্রথম এসব পদ্ধতির মৌলিক উপাদানগুলো প্রয়োগ করে ধন্য হয়েছেন।[৪১]

এভাবে ২য়/৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আরবী সাহিত্য এবং সমালোচনার উন্নতির ক্ষেত্রে অনেক প্রভাবশালী উপাদান প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। সামীরা আর্যদের সাথে সহযোগিতা করতে থাকে, বৈজ্ঞানিক উৎসাহ মজবুত হতে থাকে, সামাজিক জীবন শিল্পীসুলভ হতে থাকে এবং প্রাচীন সাহিত্যের বিরুদ্ধে নতুন এক আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে। কবি আবু নু'আস সর্বপ্রথম এই আন্দোলনের নীল নকশার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাশ্শার বিন্ বুরদ্, আবু আল-আতাহিয়্যা, মুসলিম বিন অলীদ এবং আরও অনেকেই এর ছায়াতলে কাজ করেছেন। এ সকল কবি আধুনিক মতবাদীর দল হিসেবে বহুল পরিচিত ছিলেন। তাঁরা আধুনিক সুসংস্কৃত কবিতার একটি ক্ষেত্র উত্তরাধিকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। এ সময় কবিতা নিজেই এর শব্দ, অর্থ, মাত্রা এবং গঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং মহাকাব্য ও নাটকের কারণে সঙ্গীতাঞ্চল ত্যাগ করেনি। সমালোচকগণ কবিতায় এসব পরিবর্তনকে অভিনন্দন জানান। তাঁরা কবিতার পুরাতন ও নতুন গতিধারার মধ্যে তুলনা করতে থাকেন। এবং প্রাক-ইসলামী এবং ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের সমালোচকদের

সমালোচনাকে পুরাতন আন্দোলন প্রভূত বিবেচনার সাথে গ্রহণ করেছেন। নতুন আন্দোলন কবিতাকে গভীরভাবে এমন এক সময় অনুসন্ধান করে যখন কবিতা নির্ধারিত জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অনুসরণ করতে থাকে। একজন কারিগর বা দক্ষ আলংকারিক হিসেবে এই আন্দোলনের ভাবকে গভীরতর ও উৎপাদনমুখর করে তুলে এবং রচনাশৈলীর দিক নির্দেশ করে। এই দু'টি আন্দোলনের সমন্বয়ে সাহিত্য সমালোচনা কাজ করতে থাকে এবং ৩য়/৯ম শতাব্দীর আগ পর্যন্ত পূর্ববর্তী নির্দেশনাগুলো গ্রহণ করতে থাকে।[৪২]

৩য়/৯ম শতাব্দী হতে সমালোচক এবং গবেষকগণ ইসলামী সংস্কৃতিতে অংশ গ্রহণ করেন এবং তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। ধর্মতত্ত্ববিদগণ কুরআন, হাদীস, ইসলামী আইন শাস্ত্র এবং এর নীতিমালাগুলো যত্নসহকারে ধারণ করেন। ভাষাতত্ত্ববিদগণ শব্দ, বাগবিধি, আঞ্চলিক ভাষাগুলো একত্রিত করেন এবং ব্যাকরণ, ভাষাবিদ্যা এবং ছন্দশাস্ত্রের উপর পুস্তক সংকলন করেন। জীবনী-প্রণেতাগণ প্রাচীন পারস্য, রোম এবং সিরীয়বাসীর (পূর্ব সিরীয় গীর্জার সদস্যগণ) ধ্বংসাবশেষগুলো পরিভ্রমণ করেন এবং সেগুলো জনপ্রিয় এবং মনোরম আরবী ভাষায় রচনা করেন। আল-জাহিয, সাহাল বিন্ হারুন, আবু তাম্মাম, ইব্ন আল-রুমীর ন্যায় বিভিন্ন কবি এবং লেখক বৈজ্ঞানিক জীবনের ছায়াতলে লালিত হয়েছেন। আর তাই সমালোচনাও এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ সকল মানসিকতার মধ্য থেকে সমালোচকগণ চারটি দলে অস্তিত্বলাভ করে: ভাষাতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক, বৈদেশিক সংস্কৃতি ও শিক্ষায় যৎসামান্য প্রভাবিত পণ্ডিতগণ এবং গ্রীক শিক্ষায় ব্যাপক প্রভাবিত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ। এখানে তাঁদের জন্য সমালোচনার দু'টি সাধারণ নীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী যুগ থেকে তাঁরা একটি নীতি খুঁজে পেলেন এবং অপরটি পেলেন দর্শন, ধর্মমত, অলংকার শাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যা থেকে। সমালোচকের এই চারটি দলেরই নিজস্ব কৌতুক, দৃষ্টিভঙ্গি, সাহিত্য পুস্তক ও সাহিত্য পত্রিকা আছে।[৪৩] সমালোচকদের এই চারটি দলের কারণে সমালোচনার দিক এবং আধুনিক কবিতার অবস্থান বিভিন্ন আকার ও রূপধারণ করে। কিন্তু ৩য়/৯ম শতাব্দীর সমালোচকগণ বর্ণনা, বিচার এবং সাজানোর ক্ষেত্রে ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর সমালোচকদের ছেড়ে যেতে পারেনি।

৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে আরবী কবিতা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। একটি পরিচ্ছন্ন অবস্থান লাভের উদ্দেশ্যে দার্শনিক সীমারেখা পরিহার করে এবং প্রসারতা, অন্তর্ভুক্তি, নিগূঢ়তা ও সূক্ষ্মতা অর্জন করে প্রাচীন সমালোচনার সর্বশেষ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে। কারণ পুরাতন সাহিত্যে দক্ষতা-অর্জিত সাহিত্য সমালোচনা এবং আধুনিক সাহিত্যের দ্বারা অনুশীলন-প্রাপ্ত শৈল্পিক সৌন্দর্যের গতিধারা এই সমালোচনার চারপাশে বিরাজ করছিল। ফলে সমালোচকদের অপরিমিত তুলনামূলক অধ্যয়ন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে সাহিত্য সমালোচনা রুচির প্রবণতায় পরিপক্কতা অর্জন করেছে। তাঁদের সাহিত্যিক রুচি এবং সমালোচনা-মূলক অধ্যয়ন স্বভাবতঃ মার্জিত ছিল যা মানানসই বৈজ্ঞানিক এবং বুদ্ধিগত সংস্কৃতির রূপ ধারণ করে। এখানে তাঁদের সমালোচনা চিন্তার গভীরতায় ও দিগন্তের প্রসারতায় পার্থক্য সূচনা করে সাহিত্য সম্পর্কিত প্রকাশনার ব্যাখ্যা তাঁদেরকে সমালোচনার যথাযথ নীতি প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। তাই যতটুকু জানা যায় সমালোচনাকে অতীতের যুক্তিবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রের নিয়ম কানুনের প্রতি ফিরে যেতে হয় এবং এটাকে কবিতায় আরোপের জন্য কুদামা বিন জাফর তাঁদেরকে উপদেশ দেন। এভাবে আবু তাম্মাম এবং বুহতুরী, মুতানাব্বী এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই সংঘটিত হয়। তাই, এই শতাব্দীতে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সমালোচকগণ বেশ কিছু সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। উদাহরণ স্বরূপ, আল-আমিদী কর্তৃক "আল-মুআযানা বাইনা আবি তাম্মাম ওয়া আল-বুহতুরী," আল-সুলী কর্তৃক "আখবার আবি তাম্মাম", কাজী আল-জুরজানী কর্তৃক "আল ওয়াসাতা বাইনাল মুতানাব্বী ওয়া খুছুমিহি", আবুল ফারাজ আল-ইস্ফাহানী কর্তৃক "কিতাবুল আগানী", ছাহিব বিন আব্বাদ কর্তৃক "আল-কাশ্‌ফ আন মাসাভী ফী শি'র আল-মুতানাব্বী" নামক একটি রিসালা, এবং আল-হাতিমী কর্তৃক "মা তাওয়ারাদা মিনাল মা'নী বায়না আবি আল-তায়্যিব আল-মুতানাব্বী ওয়া আরাসতু" নামক একটি রিসালা। একই শতাব্দীতে সাহিত্য সমালোচনায় কাব্যিক চৌর্য (সিরকা) খুঁজে বের করার জন্য একটি পন্থা উন্মোচন করা হয়। ফলে এই শতাব্দীতে সাহিত্যিকগণ কর্তৃক কোন সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ অস্পর্শ থেকে যায়নি এবং সমালোচনারও কোন দ্বার বন্ধ থাকে নি।[৪৪]

আরবদের পরম কৃতিত্ব এবং ৫ম/১১শ শতাব্দীর সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান আবদুল কাহির আল-জুরজানীর (মৃ. ৪৭১/১০৭৮) দ্বারা উন্নতির পরম শিখরে পৌঁছে। তিনি আসরার আল-বালাগা (অলংকার শাস্ত্রের গোপনীয়তা) এবং দালাইল আল-ইজাজ (কুরআনের অনুপম চিহ্ন) নামক দু'টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি তাঁর প্রচলিত "Theory of Construction" (গঠনতত্ত্ব) এর জন্যে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। গঠনতত্ত্ব হলো রচনা ভাণ্ডার সদৃশ একটি বর্ণনা প্রসঙ্গ যা থেকে সকল সম্ভাব্যমূলক সৌন্দর্যের ছায়া সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় (The Theory of construction is that the context in itself is the only repository from which every possible shade of beauty in literature comes forth)। প্রমাণের জন্য আল-জুরজানী ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোর পর্যালোচনার উপর নির্ভর করতেন এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি এটা প্রদর্শন করতে চেষ্টা করেন যে, সাহিত্যিক বর্ণনা সৌন্দর্যতাত্ত্বিক এবং আবেগজনিত রূপে এ-সকল ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী পার্থক্য সূচিত হয়েছে।[৪৫] আরবী সাহিত্য সমালোচনার ধারা ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী থেকে ১৩শ/১৯শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে অবনতির শেষ প্রান্তে উপনীত হয়। এ যুগে অনেক সাহিত্য সমালোচকেরই আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু কেউ সম্মানের উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারেনি অথবা অগ্রদূত হিসেবেও কেউ নিজেকে উচ্চস্থানে সমাসীন করতে পারেনি। তবে দু'একজন খ্যাতিনামা সাহিত্যিক ও সমালোচক যে এ যুগে আবির্ভূত হননি তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে ৮ম/১৪শ শতাব্দীর তিউনিসীয় ইব্‌নে খাল্‌দূনের (মৃ. ৮০৯/১৪০৬) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস তাঁর প্রধান অবলম্বন হলেও আরবী সাহিত্যে ইব্‌নে খাল্‌দূনের আগ্রহের অভাব ছিল না। তিনি নিজে সুলেখক ছিলেন। গদ্য যেমন পরিষ্কার লিখতেন, কবিতাও তেমনি অলংকার ভূষিত। সাহিত্যিক বা কবি হিসেবে ইব্‌নে খাল্‌দূনের মূল্য যাই হোক না কেন সমালোচক হিসেবে তাঁর সাফল্য সন্দেহাতীত। সাহিত্য সমালোচনায় তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। আরবী কথন ও কাব্যের আলোচনায় ও আরবী কাব্যের বিভিন্ন রূপের পরিচয় দানে ইব্‌নে খাল্‌দূনের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি বারংবার যেমন পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে

তেমনি আরবী মানসের বিশ্লেষণে তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকট। তাঁর মতে শব্দই পদ্য ও গদ্যকে ক্রিয়াশীল করে, ভাব নয়। শব্দ মুখ্য, ভাব গৌণ। তবে আধুনিক সমালোচকরা তাঁর সাথে একমত হতে পারবেন না, তার কারণ, ভাবকে শব্দের সঙ্গে সমান প্রাধান্য না দিলে পদ্যের মধ্যে বড় এক ফাঁক থেকে যাবে ও গদ্য হবে বিকলাঙ্গ।[৪৬] পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শের ফলশ্রুতি হিসেবে ১৩শ/১৯শ শতাব্দীতে আরবদের এবং মুসলমানদের মধ্যে যে জাগরণ এসেছিল তা সাহিত্যে সমালোচনার ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্‌ঘাটন করে। এটা সাহিত্য সৃজনশীলতার এবং ছন্দশাস্ত্রের তথাকথিত কঠোর নিয়মাবলী থেকে স্বাধীনতা লাভের প্রতি উদ্দীপিত করে। সাহিত্য সমালোচনার আধুনিক মতবাদের আলোকে এটা বিষয়বস্তুর উপর প্রাচীন ভাবও ধারণার বিশ্লেষণকে পুনর্জাগরণের প্রতিও পরিচালিত করে। অধিকন্তু সাহিত্য সমালোচনার নতুন নতুন গোষ্ঠীও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নতুন মতবাদীদের মধ্যে আক্কাদ, আল-মাযিনী এবং শোকরী সনাতন কবিদের প্রতি আঘাত হানেন। এই মতবাদীদের মতে, একটি ভাল কবিতার জন্য প্রয়োজন হলো: মৌল ঐক্য, আন্তরিকতা (অকৃত্রিমতা), অতিরঞ্জিত ও কৃত্রিমতাকে পরিহার করা এবং গর্বিত বা স্ফীত ভাষা। আধুনিক আরবী সাহিত্য সমালোচনা কবিতা ব্যতীত নাটক ও উপন্যাস, ছোট গল্প ও প্রবন্ধের ন্যায় অন্যান্য সাহিত্যিক রূপ অন্তর্ভুক্তির জন্য নিজের সীমান্ত প্রসারিত করেছে। ফলে সাহিত্য সমালোচনা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আরবী সাহিত্য সমালোচনার বিশেষজ্ঞগণের সংখ্যা আরব ভাষাভাষী জগতে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এ বিষয়ে তারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।[৪৭]

আরবী সাহিত্য সমালোচনা সর্বদা আরবী সাহিত্যের পর্যায়ক্রমিক উন্নতিকে অনুসরণ করে এবং সাহিত্য বিষয়ক বিরোধের গতি ও এর বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগের ব্যাখ্যাসহ সাহিত্য সমালোচনা নিজেই স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করে। আধুনিক আরবী সাহিত্য সমালোচনাও ঠিক একইভাবে আধুনিক আরবী সাহিত্যকে অনুকরণ করে। আরব দেশ-সমূহে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিশেষ করে ফরাসী ও ইংরেজী সংস্কৃতির প্রভাবে সাহিত্য সমালোচনা ও উন্নতি লাভ করে। আরবী সাহিত্য সমালোচনার উন্নতি বিধানে আধুনিক সমালোচকবৃন্দ যদি বৈদেশিক

সাহায্যের প্রার্থনা করে তা হলে কোন দোষ হবে না ; যেমন অতীতে ক্লাসিক লেখকগণ, গ্রীক, রোমান, ফার্সী এবং ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের নিয়মকানুন আরবীতে প্রবর্তন করেছিলেন। আধুনিক আরবী সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব আরবী সাহিত্যের মূল কোন অংশে কমাতে পারে না। বিভিন্ন আন্দোলনের মতবাদ যেমন, রম্যবাদ, বাস্তববাদ, পরাবাস্তববাদ,[৪৮] প্রতীকবাদ, গীতধর্মী বিশ্লেষণ, অস্তিত্ববাদ, অভিব্যক্তিবাদ এবং আঞ্চলিকতাবাদ আধুনিক আরবী সাহিত্য এবং তার সমালোচনার বিভিন্ন স্তরকে প্রভাবিত করে। বিদেশী সভ্যতা সাহিত্যের শুধু মূল বিষয়বস্তুতে প্রভাব বিস্তার করেনি বরং রূপ এবং রচনাশৈলীতেও প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক আরবী সাহিত্যে এই প্রভাব সুস্পষ্ট। আরবী সাহিত্যে গীতি কবিতার (Strophic verse কবিগানের) সূচনা, অমিত্রাক্ষর ছন্দ (Blank-verse) এবং মুক্ত ছন্দের (Free-verse) আধুনিক ব্যবহার অবশ্যই অনস্বীকার্য। কল্পনা প্রবণতা, অমিত্রাক্ষর এবং মুক্ত ছন্দ আরব বিশ্বের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক গোষ্ঠী বা আন্দোলনকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। একটি হচ্ছে আমেরিকাতে এবং অপর দু'টি হচ্ছে মিশরে। এই তিনটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী আধুনিক যুগে আরবী সাহিত্য সমালোচনাকে একটি নির্ধারিত ধাপ পর্যন্ত অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রভাবিত করে। প্রথম গোষ্ঠীতে রয়েছেন তিনজন প্রাক-কল্পনাবাদী কবি : আব্বাস মাহ্-মূদ আল-আক্কাদ (মৃ. ১৩৮৪/১৯৬৪), ইব্রাহীম 'আবদুল কাদির আল-মাযিনী (মৃ. ১৩৬৯/১৯৪৯) এবং আবদুর রহমান শুকরী (মৃ. ১৩১৮/১৯৫৮), যারা গীতি কবিতা (কবিগান) রচনা করেন এবং ১৩৩৯/১৯২০ এবং ১৩৪৯/১৯৩০-এ দিওয়ান গ্রুপ গঠন করেন। রোমান্টিক গোষ্ঠীর দ্বিতীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আহ্মদ যাকী আবু শাদী, ১৩১০/১৮৯২ থেকে ১৩৭৫/১৯৫৫ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং শিক্ষিত হন। ১৩৩১/১৯১২ থেকে ১৩৪১/১৯২২-এর মধ্যে তিনি ইংল্যাণ্ডে ডাক্তার এবং রোগ-জীবাণুবিৎ হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেন। ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ জন্মেছিল, বিশেষ করে রোমান্টিক সাহিত্যিক শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীট্‌স, ডিকেন্স্ এবং জর্জ বার্ণাড শ-র প্রতি। মিশরে প্রত্যাবর্তন করে রোমান্টিক কবিদের নিয়ে তিনি এ্যাপোলো নামক একটি সাহিত্যিক দল গঠন করেন যা 'এ্যাপোলো' নামক তাঁর সাহিত্য

পত্রিকার নামানুসারে রাখা হয়। এই পত্রিকাটি ১৩৫১/১৯৩২ এবং ১৩৫৩/১৯৩৪-এর মধ্যবর্তী সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। এটি গীতিমূলক চরণ, ইংরেজী সনেট, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং মুক্ত ছন্দের অনুপ্রেরণা যোগায়। তৃতীয় আন্দোলন হচ্ছে মাহজারী (দেশান্তরী সাহিত্য) অথবা আমেরিকানদের আরবী কবিতা। ১২৭৭/১৮৬০-এ আরব দেশত্যাগীগণ বিদ্রোহের কারণে সিরিয়া এবং লেবানন হতে আমেরিকায় পলায়ন করে। এই দল একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁদের নিজস্ব আরবী সংবাদ পত্রিকা এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। এর অধিকাংশ সদস্য মার্কিন সাহিত্যের বিশেষ করে এডগার এলেন পো, ওয়াল্ট হুইট ম্যান এবং লংফেলো-এর সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত। দেশান্তরী কবিদের মধ্যে ছিলেন ইলয়া আবু মাদী (জন্ম ১৩০৭/১৮৮৯, মৃত্যু ১৩৭৮/১৯৫৮) এবং জিবরান খলীল জিবরান (জন্ম ১৩০১/১৮৮৩ মৃত্যু ১৩৫০/১৯৩১)।[৪৯]

উল্লেখ্য যে, আধুনিক যুগে আরবী সাংবাদিকতার উন্নতি সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা উন্মেষের ক্ষেত্রে এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মিশ্রণে নন্দনতত্ত্বের (ইলম আল-জামাল) ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন কবিগণ বিখ্যাত প্রাচীন কবিদের ধারায় কবিতা লিখতে থাকে তখন কবিতার পুনর্জাগরণী পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কবিতার ক্ষেত্র সুপ্রসারিত হয়েছে। এভাবে পাশ্চাত্য কবিতার আলো আরবী কবিতা এবং তার সমালোচনার মধ্যে প্রতিফলিত হতে শুরু করে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে আরবী কবিতা পুনর্গঠনের এক আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনের নেতাগণ খুব নিকট হতে পর্যবেক্ষণ করেন যে, পাশ্চাত্য কবিতা বাধাবিপত্তি ও রীতিনীতি থেকে অনেকটা মুক্ত এবং তার বিষয়বস্তুও অধিকতর পরিচ্ছন্ন। তাঁরা এও পর্যবেক্ষণ করেন যে, ইউরোপীয় কবিতার পরিধি আরবী কবিতা অপেক্ষা অধিক প্রসারিত এবং সময়ের প্রতিফলন বর্জিত। যখন কবিগণ আরবী কবিতায় পুনর্জাগরণে মনোনিবেশ করলেন এবং কবিতার প্রকৃতিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন যে, কবিতা তথাকথিত ভালবাসা, প্রেমমূলক, প্রশংসা এবং শোকগাঁথা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে রচিত হয়েছে এবং কবিতায় যুবতী ও সুন্দরী মহিলাদের চুলকে রাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে, তার মুখাবয়বকে উষার সাথে, তার ভ্রূকে তরবারির

সাথে, তার চক্ষুকে ড্যাফোডিল জাতীয় পুষ্পের সাথে, তার গালকে গোলাপের সাথে, তার দাঁতকে মুক্তার সাথে এবং থুথুকে মধুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আবার কোন বীরের প্রশংসা করতে গিয়ে তার বীরত্বকে সিংহের সাথে, বদান্যতাকে হাতিমের সাথে, দানশীলতাকে সমুদ্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং ব্যক্তি তার সম্পর্কে সকল তথ্য তার হৃদয়ে সংরক্ষণ করে এবং দীর্ঘজীবী হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে—তখন কবিগণ এবং লেখকগণ ফাঁদে আটকে পড়া আরবী ভাষাকে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা, শৃঙ্খল এবং বেষ্টনী থেকে মুক্ত করার কথা ভাবলেন। তাই তাঁরা ফ্রান্স এবং ল্যাটিন কবিতাসমূহ আরবীতে এমন এক ধারায় অনুবাদ করলেন যে, এরা অলংকার শাস্ত্রের অনুপমতা হারায়নি অথবা এর গুণগত মান ব্যাহতও হয়নি। অনুবাদের ধারায় তাঁরা এমন এক পর্যায় অতিক্রম করেন যেখানে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ঐসকল তথ্য ও উপকরণ আরবী সাহিত্যে কখনো দেখা যায়নি। তাই তাঁরা প্রাচীন সাহিত্য রীতি, পদ্ধতি এবং সমালোচনা পরিহার করেন এবং তদস্থলে ইউরোপীয় সাহিত্য এবং তাঁদের সমালোচনা প্রবর্তন করেন।[৫০]

আরবী সাহিত্য এবং সমালোচনার আধুনিকীকরণের এই প্রবণতা মিশর থেকেই শুরু হয় এবং অতি দ্রুত গতিতে তা ব্যাপক প্রসারিত হয় এবং সফলতার সাথে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, ফলে নেতাগণ কারারুদ্ধ এবং নির্বাসিত হন। এরপর আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নব যুগের সূচনা হয় যা আরবী জীবন-পদ্ধতিতে এক নব জাগরণ এনে দেয়। এ সময় থেকে লেখক গোষ্ঠী পত্রিকা এবং সাময়িকী সমূহ প্রকাশ করতে থাকেন এবং এর মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শকে প্রকাশ করার সুযোগ পান যা পরবর্তীতে সাহিত্য মর্যাদায় গৃহীত হয়। তাঁরা এরই মাধ্যমে জনগণকে পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং চিন্তাধারার গভীরতা এবং পরিব্যাপকতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ধীরে ধীরে এ সকল প্রকাশনা রাজনৈতিক রং এবং সম্বন্ধ হারিয়ে নির্ভেজাল সাহিত্য পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এই মতবিরোধ এক পর্যায়ে বিক্ষোভের আকার ধারণ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেকার এ সকল প্রসিদ্ধ নেতাগণ বর্তমানে সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে অধিক জেদী

ও তেজস্বী হন। এদের মধ্যে আল-আক্কাদ এবং আল-মাযিনী বিশেষ করে কবিতায় এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। হায়কাল (মৃ. ১৩৭৬/১৯৫৬) উপন্যাস রচনার এক স্বতন্ত্রধর্মী কলাকৌশল আবিষ্কার করেন এবং ত্বাহা হুসাইন (মৃ. ১৩৯৪/১৯৭৪) জীবনী সাহিত্য সম্পর্কে এক দৃঢ় পদক্ষেপ নেন। আক্কাদ এবং মাযিনী আধুনিকীকরণের পদ্ধতি প্রয়োগ করে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হন যার মাধ্যমে তাঁরা শাওকী এবং হাফিযের গীতিধর্মী বৈশিষ্ট্য ম্লান করে গীতি কবিতায় এক নতুন রূপের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। আক্কাদ এবং মাযিনী কঠোরভাবে শাওকীর সমালোচনা করেন এবং মাযিনী শুকরী ফয়সলের উপর একটি সমালোচনামূলক রচনা লিখেন। এই একই লেখক মানফালুতী এবং তাঁর রচনাশৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন যে, তাঁর রচনাগুলো অর্থ ও ভাবশূন্য শব্দগুচ্ছের সমাহার স্বরূপ। তাঁর রচনা-শৈলী অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল এবং শুধু আবেগের প্রাচুর্যেই প্রভাব বিস্তার-কারী। একজন আধুনিক সাহিত্যিক জোরালো এবং সুরুচিপূর্ণ রচনা-শৈলীর উপরই কেবল গুরুত্ব আরোপ করেন না, বরং তিনি চিন্তার গভীরতাও অনুসন্ধান করে থাকেন যা হৃদয়ের কোমল এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিসহ আবেগের জটিল স্তরগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। মাযিনী গদ্য রচনায় এই ধারা প্রয়োগ করে প্রায়ই ইউরোপীয় সাহিত্য কর্ম আরবীতে অনুবাদ করেন এবং কখনো কখনো পাশ্চাত্য ছাঁচে আরবী কাহিনী বা কথা সাহিত্য লেখেন। এ ধারার আওতায় আক্কাদ এক বিশাল সাহিত্য ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। এভাবে আল-রাফিয়ী, আল-মুয়াইলিহী এবং আরও অনেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্য থেকে দোষ-ত্রুটিসমূহ অপসারণের মাধ্যমে মার্জিত রুচির প্রচুর পরিচয় দেন। লেবাননের লেখক সুলাইমান আল-বিস্তানী হোমারের ইলিয়াড গ্রীক ভাষা থেকে আরবীতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ আধুনিক আরবী সাহিত্য ও সমালোচনার ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সুলায়মান আল-বিস্তানী এই অনুবাদের সূচনাতে সাহিত্য সমালোচনার রীতি-নীতি সমূহ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, এর একটি তাত্ত্বিক সমা-লোচনা, অপরটি ব্যবহারিক সমালোচনা।[৫১]

ইব্রাহীম আল-ইয়াযিজী (মৃ. ১৩২৪/১৯০৬) ছিলেন আধুনিক আরবী সাহিত্যে প্রথম সমালোচক। তিনি রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক

পরিবেশ কর্তৃক প্রভাবিত আধুনিকীকরণের সাথে সম্পর্কিত আরবী ভাষার সার্বিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা আরবী ভাষার ত্রুটি এবং জড়তাকে সংশোধন করেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, চিন্তাধারা এবং আদর্শে প্রভাবিত হয়ে আধুনিক সমালোচকগণ দু'টি দলে বিভক্ত হন। প্রথম দলটি ফরাসী সমালোচক এবং লেখকদের প্রবর্তিত সমালোচনার পদ্ধতি এবং রীতিনীতিসমূহ অনুকরণ করেন। এ দলের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিত্ব এবং সমালোচকগণের মধ্যে ত্বাহা হুসাইন, হায়কাল, মাযিনী, মানসূর ফাহমী, যাকী মুবারক (মৃ. ১৩৭২/১৯৫২), মুহাম্মদ মানদূর (মৃ. ১৩৮৫/১৯৬৫) প্রমুখ সমালোচকের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় দলটি ইংরেজ লেখক এবং সমালোচকদের অনুসৃত রীতিনীতি এবং সমালোচনা অনুসরণ করেন। আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, শুকরী ফায়সাল, আহ্‌মাদ আল-শাইব (মৃ. ১৩৭৪/১৯৫৪), আহমদ আমীন, যাকী আবু শাদী, ইব্রাহীম আবদুল কাদির আল-মাযিনী এবং আরও অনেকে এই দলের প্রতিনিধিত্বশীল সমালোচক ছিলেন। ব্যবহারিক সমালোচনার উপর ত্বাহা হুসাইন হাদীছ আল-আরবি'আ, মা'আল মুতানাব্বী, যিকরা আবিল 'আলা, আদাবুল-জাহিলী, ফুসূল ফিল আদব ওয়া আল-নাক্‌দ, হাফিজ ওয়া শাওকী, মিন হাদীস আল-শি'র ওয়া আল-নাছর ইত্যাদি গ্রন্থ লিখেন। তিনি 'তাত্ত্বিক' সমালোচনার উপর কোন গ্রন্থ লিখেননি এবং শিল্প সম্পর্কে যে কোন "আইনের" দৃঢ় প্রতিবাদ করেন এবং তাই আমরা ত্বাহা হুসাইনের নন্দনতত্ত্বে যে কোন সুবিদিত মতবাদ অনুসন্ধানের ইচ্ছা পোষণ করতে পারি না। যদিও পরবর্তী বছরগুলোতে তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রচেষ্টা সামাজিক অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, তথাপি তাঁর অধিকাংশ রচনা সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনায় গঠিত ছিল। তাঁর ফিতনা আল কুবরার দ্বিতীয় খণ্ডে পাশ্চাত্যের শেক্সপিয়ারের প্রতি এবং ইসলামের প্রথম পাঁচ শতাব্দীতে প্রাচ্যে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা প্রকাশ পায়। মিশরীয় অধিকাংশ পাঠকের মতামত ব্যক্ত করে ডক্টর সি. সি. এডাম্‌স বলেন যে, ত্বাহা হুসাইন আরবী সাহিত্য পাঠে পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচনার নিয়ম-কানুন নির্ভীকভাবে প্রয়োগ করেছেন। সমালোচনার প্রাচীন পদ্ধতিতে ইতিপূর্বে যে সকল বাধা বিপত্তি একে ব্যাহত করেছে তিনি তা মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন এবং মিশরীয় পাণ্ডিত্যকে পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যের

তুলনায় বৈজ্ঞানিক দক্ষতানুসারে বৃদ্ধি করেছেন।[৫২] প্রাক্-ইসলামী কবিতার উপর তাঁর বিতর্কিত চিন্তাধারা আধুনিক বিজ্ঞান এবং দর্শনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাই তিনি আধুনিক যুগের শুরুতে বস্তুর বাস্তবতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য সাহিত্যে ডেকার্ট কর্তৃক দার্শনিক মতবাদ প্রয়োগের ইচ্ছা করেন।[৫৩] এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ত্বাহা হুসাইন পূর্ববর্তী সকল গ্রহণীয় ধারণাকে ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করতে মনস্থ করেন এবং সাহিত্যের অধ্যয়নকে দার্শনিক কর্তৃত্ব এবং ধার্মিক, জাতিগত এবং জাতীয় পক্ষপাত থেকে মুক্ত করতে চান। তিনি আরও অধিক সাহসিকতার সাথে দাবি করেন যে, ধর্মীয় বিবেচনার উপর হস্তক্ষেপ না করে সাহিত্যকে শুধু সাহিত্য হিসেবেই পাঠ করা উচিত।[৫৪] তিনি প্রথমে পর্যালোচনা করলেন যে, সাহিত্যের সাথে সমালোচনার সম্পর্ক এত নিকটতম যে বাস্তবে তিনি প্রায়ই সেগুলো "সাহিত্য" নামের অধীনে সৃজনশীল সাহিত্যে (যে সাহিত্য সরাসরি জীবন সম্পর্কে আলোচনা করে) এবং বর্ণনামূলক সাহিত্যে (যা সৃজনশীল সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করে) বিভক্ত করেন। তাঁর নিকট প্রকৃত পক্ষে সৃজনশীল সাহিত্য নির্ভেজাল শিল্প এবং বর্ণনামূলক সাহিত্য (যেমন, সাহিত্যের ইতিহাস, অথবা সাহিত্য বিষয়ক ইতিহাস অথবা সাহিত্যের বিজ্ঞান সমূহ) আংশিক শিল্প এবং আংশিক বিজ্ঞান।[৫৫]

এই শৈল্পিক এবং বৈজ্ঞানিক উপাদান দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং মিশ্রিত হলেও এরা সব সময় স্বতন্ত্র। বর্ণনামূলক সাহিত্যের কিছু শাখা-প্রশাখা যেমন—ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, অলংকার শাস্ত্র, মূল পাঠের সংস্করণ ও টীকা রচনা এবং সমালোচকের প্রারম্ভিক উপকরণের অংশ—যথা, ভাষা, ইতিহাস, মূল পাঠের পরীক্ষা-নিরীক্ষা—এসব হলো খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু বর্ণনামূলক সাহিত্যের ঐ অংশ এবং সমালোচনামূলক প্রক্রিয়া যা আরোপিত মূল্যে গঠিত, যে অংশ সাধারণতঃ "সাহিত্য সমালোচনা" হিসেবে বুঝা যায় এবং ত্বাহা হুসাইন যার প্রতি নাক্দ (সমালোচনা) শব্দ প্রয়োগ করেছেন, বিজ্ঞানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, বরং শুধু রুচির উপরই এর নির্ভর করা অত্যাবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে সমালোচককে বিবিধ অস্ত্ররূপ হতে হবে একটি নিখুঁত আয়না। যেমন, লেখক যাকে সে সমালোচনা করছে, দায়িত্বশীল পাঠক যার "সাধারণ" রুচিতে অংশ গ্রহণ করে,

প্রতিনিধিত্ব করে এবং অবশেষে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বে একজন বিচারক সুলভ সমালোচক হয়ে ওঠে।[৫৬] আমাদের প্রত্যেকেরই শুধু বিভিন্ন স্তরের নিখুঁত স্বতন্ত্র রুচিই নেই, "সাধারণ" রুচিবোধও আছে, অর্থাৎ, একই বংশের ও একই পরিবেশের সকল লোকের একটি সাধারণ রুচিবোধ রয়েছে। যদিও প্রত্যেকের আবার নিখুঁত স্বতন্ত্র একটি করে রুচিবোধ থাকে। জাতীয় ভিত্তিতে এর প্রয়োজন নেই—উদাহরণ স্বরূপ, মিশরে আজহারীদের নিজস্ব রুচিবোধ আছে, কিন্তু ত্বাহা হুসাইন এই সাধারণ রুচি বোধকে জনাকীর্ণ প্রতিক্রিয়ার সাথে বিভ্রান্ত করে ফেলেছেন বলে মনে হয়। তাই তিনি উদাহরণ হিসেবে একটি ব্যাখ্যাকর চিত্র উপস্থাপন করেন যে, তিনি কোন এক সাহিত্য গোষ্ঠীভুক্ত থাকাকালীন মোস্তফা কামালের প্রশংসায় যখন শাওকীর গীতি কবিতা প্রথম শুনলেন, তাঁর সাধারণ রুচি তাঁকে ঐ দলে যোগদানে উৎফুল্লভাবে অনুমোদন করে ; কিন্তু যখন তিনি জনৈক বন্ধুর সঙ্গে কবিতাটি পুনর্বিচার করলেন তখন তাঁর ব্যক্তিগত রুচিবোধ তাঁকে বুঝতে সাহায্য করলো যে, এটা ছিল আবু তাম্মামের গীতি কবিতার একটি দুর্বল ও হাস্যকর কালবিরোধী অনুকরণ।[৫৭]

ত্বাহা হুসাইনের চূড়ান্ত মতানুসারে সমালোচনাকে একটি বিজ্ঞান-সম্মত (অথবা খাঁটি বস্তুনিষ্ঠ) অংশে ও একটি শৈল্পিক (অথবা সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী) অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে। বিজ্ঞান এবং শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যে মিশ্রিত না হয়ে যে সাহিত্য পর্যালোচনা হয় শুধু তাই হলো মূল পাঠ সংক্রান্ত সমালোচনা। মূলপাঠ সংক্রান্ত সমালোচনায় তাঁর নিজস্ব অবদান হলো সামান্য। তবে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে আবদুল হামীদ আল-আব্বাদীর সহযোগিতায় তিনি "নাকদ আল্-নাছর" সম্পাদনা করেন। বইটির পাণ্ডুলিপি আল-আব্বাদী এসকুরিয়াল গ্রন্থাগারে আবিষ্কার করেন। বইটির লেখক কুদামা বিন্ জাফর বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু ত্বাহা হুসাইন নাক্দ আল-নাছর গ্রন্থটির এক সমালোচনামূলক ভূমিকায় অভ্যন্তরীণ প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রন্থটি কুদামা কর্তৃক লিখিত নয় বলে যে সুনিশ্চিত ধারণা দেন তাতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতার পরিচয় পাওয়া যায়। মূলতঃ ১৯৪৮ সালে চেস্টার বেটির অপর একটি সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে নাক্দ আল-নাছর ছিল আবুল হুসাইন ইসহাক বিন্ ইব্রাহীম বিন্ সুলাইমান বিন্ ওহাব আল-

কাতিবের আল-বুরহান ফি-উজুহ আল-বায়ান এর প্রথম খণ্ড।[৫৮] ত্বাহা হুসাইনের মতে নিখুঁত অবস্থায় কবিতার প্রথম আগমন হয়। কারণ, কবিতা নিজেই পরমোৎকৃষ্ট এবং অকৃত্রিম এবং এর আনুসঙ্গিক ঘটনা- বলীর সঙ্গে প্রায়ই সামঞ্জস্যহীন।[৫৯] তাঁর সুরুচিসম্পন্ন সমালোচনায় বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়ক ভাবমূর্তি প্রকাশ পায়। কেননা, এই ধরনের সমালো- চনায় একটি সম্মত উপাদান রয়েছে। একজন কবি সম্পর্কে পর্যা- লোচনার জন্য ত্বাহা হুসাইন Sainte Beuve, Taine এবং Jules Lemaitre-র প্রধান নীতিগুলো পুঞ্জীভূত করার চেষ্টা করেন। এ পর্যায়ে প্রথমে কবির ব্যক্তিত্ব, পরে তার পারিপার্শ্বিকতা এবং পরি- শেষে কবিতায় প্রাপ্ত শৈল্পিক আনন্দ তিনি ব্যক্ত করেন।[৬০] তিনি একথা স্বীকার করেন যে, তাঁর প্রাথমিক কৌতূহল ছিল কবিতার ব্যাপারে, কবির ব্যাপারে নয়। যদি তিনি কোন মানুষ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে থাকেন তবে তা হবে ভালভাবে কবিতা বুঝার জন্য। তাই এ ধরনের সমালোচনায় মনোবিজ্ঞান এবং সাহিত্যের ইতিহাস হলো আনুসঙ্গিক (গৌণ) এবং প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিল্পিজনোচিত তথা বৈষয়িক (মুখ্য)। ত্বাহা হুসাইন আরবী সাহিত্যে আব্বাসীযুগকে দুটি বড় রেনেসাঁ (নবজাগরণ) যুগের মধ্যে প্রথম হিসেবে ধারণা করেন এবং দ্বিতীয়টি তিনি সমসাময়িক রেনেসাঁ বলে ধরে নেন। বিদেশী সম্পর্কের প্রতি আব্বাসীরা কতখানি ঋণী তা এ দু'টি রেনেসাঁর মধ্যে তাঁর সমান্তরাল সাদৃশ্য দেখানোর ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়। বিশেষ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি তথা গ্রীক সংস্কৃতির অবদানকে তিনি বড় করে দেখিয়ে প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে ছোট করে দেখিয়েছেন। একথা সবারই জানা আছে যে, আরবরা গ্রীকদের অনেক পুস্তক আরবীতে অনুবাদ করেছে এবং তারা গ্রীক যুক্তিবিদ্যা এবং গ্রীক অলংকার শাস্ত্রের দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছে। ফলে বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের সকল শাখার উন্নতির জন্য তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রভাবিত হয়। আরবগণ প্রাচ্যের "সংস্কৃতির উৎস অর্থাৎ পারস্য, ভারতীয় ও সামীদের সংস্পর্শেও আসে। এরা তাই গ্রীক চিন্তাধারার সাথে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে— প্রকৃতপক্ষে, নিকটপ্রাচ্য সংস্কৃতিক উপাদানের সাথে গ্রীক চিন্তাধারার সংমিশ্রণই হলো সচরাচর" গ্রীক সাংস্কৃতিক ভাবধারার (Hellenism) পরিচায়ক। এমনকি আরবরা তাদের প্রাচ্য সামন্তবর্গ থেকে সংস্কৃতি লাভ করার সময়ও গ্রীকসংস্কৃতি সম্পন্ন ছিল।[৬১]

মূলতঃ ত্বাহা হুসাইন সমালোচনার ক্ষেত্রে এমন একটি নীতি অবলম্বন করেন যা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের অতি নিকটবর্তী এবং যার সকল আলোচনা ও পর্যালোচনা সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খায়। তাঁর মতে ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণ সাহিত্যের মধ্যে একটি গৌণ এবং বাড়তি স্থান দখল করে আছে। যখন পূর্বসূরীদের কেউ কোন কবি বা খলীফা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন তখন আমরা একে শুধু একটি অভি-মত হিসেবে গ্রহণ করব, তাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা আমাদের প্রয়োজন হবে না। আমরা এর পরিবর্তন বা রূপান্তর করতে পারি। ঐ সকল মতামতের পর্যালোচনা এবং সমালোচনা করা উচিত এবং তারা যদি কোন ভুল করে থাকে তবে আমাদের তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা উচিত। ত্বাহা হুসাইন যখন কোন কবি অথবা কোন সাহিত্যিক সম্পর্কে কোন সমালোচনামূলক মন্তব্য করতে যেতেন তখন তিনি প্রথমে তার বিস্তারিত জীবন, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সমাজ এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করতেন। অতঃপর উক্ত কবি বা সাহিত্যি-কের জীবন দ্বারা তিনি প্রভাবিত হতেন এবং তার সম্পর্কের সঠিক মন্তব্য করতেন। একথা সত্য যে, আরবী সমালোচনার ক্ষেত্রে সা'আলিবী সর্বপ্রথম পরিবেশগত পদ্ধতি এবং ত্বাহা হুসাইন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাছাড়া ত্বাহা হুসাইন নতুন চিন্তাধারা এবং ভাব-ধারা বিশেষভাবে সংযোজন করার পর আরবী সাহিত্য সমালোচনার সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।[৬২]

আল-আক্কাদ কবি ইব্ন আল-রুমীর (মৃ. ২৮৪/৮৯৭) উপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে সমালোচনা লেখায় এক নতুন ধারার সংযোজন করেন। গ্রন্থটি ইব্ন আল-রুমীর স্মৃতিচারণে একটি শ্রেষ্ঠ অবদান এবং চমৎকার সাহিত্য সৃষ্টি। তিনি ইব্ন আল-রুমীকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। আধুনিক সমালোচনা লেখার উপর এই আদর্শ গ্রন্থটি বর্তমান যুগের সমালোচকদের নিকট অসাধারণ মর্যাদা অর্জন করেছে।[৬৩]

মাহমূদ সামী আল-বারুদী (মৃ. ১৩২২/১904) কর্তৃক আধুনিক আরবী কবিতার একটি নতুন গোষ্ঠী অস্তিত্ব লাভ করে। পরে শাওকী ও হাফিজ ইব্রাহীম তাঁকে অনুসরণ করেন। তিনি আধুনিক আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। কিন্তু চৌদ্দশত/বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মিশরে আমরা এক নতুন সাহিত্য

গোষ্ঠীর উত্থান দেখতে পাই যার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য আল-বারুদী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। একথা সত্য যে আল-বারুদীর কল্যাণেই আরবী কবিতা পূর্বের হারানো মর্যাদা এবং অতীত গৌরব পুনরায় অর্জন করে এবং অলংকার শাস্ত্রের কৃত্রিম সৌন্দর্য ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। কবিগণ এখন প্রচলিত ভাব এবং লঘু কল্পনার পরিবর্তে রাজনৈতিক ঘটনা এবং সামাজিক জীবনের উদ্দেশ্যাবলী কবিতায় উপস্থাপন করেন। শাওকীর কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর কবিতায় পূর্বপুরুষদের মহৎকর্মের প্রশংসা করেছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর সাহিত্য গোষ্ঠী পুরাতন আরবী কবিতাকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তবে তাঁর অনুসারীগণ তাঁরই পোষ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। কিন্তু আল-আক্কাদ এবং তাঁর অনুসারী আল-মাযিনী এবং আবদুর রহমান শুকরী ইউরোপীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করে আরবী সাহিত্যে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেন যা প্রকৃতপক্ষে বারুদীর সাহিত্য গোষ্ঠী থেকে পৃথক ছিল। এই সব সাহিত্যিক গোষ্ঠী গভীরভাবে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ঐ কবিই সত্যিকার কবি যার কবিতায় সত্য ও নৈতিকতার প্রকাশ ঘটে এবং জাতীয় চেতনা, ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও আদর্শ, প্রকৃতির রহস্য এবং নিখিল সৃষ্টির বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়। আল-আক্কাদ এবং তাঁর সঙ্গীদের মতানুসারে রচনাশৈলীর পরিবর্তে কল্পনা এবং রূপরীতির পরিবর্তে বিষয়বস্তু অধিক গুরুত্ব বহন করে। অন্যদিকে রূপরীতি যদি প্রকৃতির উপাদান প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে তা নিশ্চিত রূপে অনুকরণীয় নয়। এ কারণেই শাওকী এবং মাযিনীর দিওয়ানে মাত্রার (মিত্রছন্দের) উদাহরণ ব্যাপক পরিলক্ষিত হয়।[৬৪]

শাওকী দায়ফ ১৩২৮/১৯১০ সালে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমান বিশ্বে জীবিত একজন প্রসিদ্ধ আরব সমালোচক। ফলিত (ব্যবহারিক এবং বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তিনি প্রখ্যাত কবি এবং লেখকদের সকল সাহিত্য-কর্ম মূল্যায়ন করে সেগুলোর উপর একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন। তিনি প্রাক-ইসলামী, ইসলামী, উমাইয়া, আব্বাসী এবং আধুনিক যুগের বিশেষ করে ১৪/২০ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি এবং লেখকদের উপর তুলনামূলক আলোচনা এবং সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করে পঁয়ত্রিশ

খানারও বেশী পুস্তক রচনা করেন। ফী আল-নাক্‌দ আল-আদাবী (সাহিত্য সমালোচনার উপর) এবং ফুসূল ফী আল-শি'র ওয়া নাক্‌দিহী (কবিতা এবং তার সমালোচনার শাখাসমূহ) নামক তাঁর দুটি গ্রন্থ ফলিত (ব্যবহারিক) সমালোচনার উপর ভিত্তি করে রচিত। তিনি আল-নাক্‌দ (সমালোচনা) নামক অপর একটি গ্রন্থ আরবী সাহিত্যের কলা-কৌশল সংকলনের আওতায় রচনা করেন। এ গ্রন্থগুলোতে শাওকী দয়ফ সকল সমালোচনামূলক বিশ্লেষণকে দুটো ঐতিহাসিক যুগে বিভক্ত করেন। প্রথম যুগটি এ্যারিস্টটলের সময় থেকে ১২/১৮ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রসারিত এবং দ্বিতীয় যুগটি ১২/১৮ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এ্যারিস্টটলের সমালোচনা ব্যতীত প্রথম যুগের সমালোচনা পদ্ধতিগত, নিখুঁত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনার দিকে পরিচালিত ছিল না। এ্যারিস্টটল গ্রীক বিয়োগান্তক নাটকে (Tragedy) সমালোচনায় প্রতিভার পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ যুগের অন্যান্য সমালোচকগণ গ্রীক কবিতায় ও বিয়োগান্তক নাটকে এ্যারিস্টটলের ব্যবহৃত সকল বিচার বিশ্লেষণ ও নিয়মকানুন পুনঃপ্রয়োগ করেন। দ্বিতীয় যুগের সমালোচকগণ তাঁদের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিফলন প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ নিবিষ্ট করেন। তাঁরা প্রকৃতি বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানের আলোকে উজ্জীবিত হয়ে সাহিত্যের জন্য একটি জীবের-তত্ত্ব (আল-তারীখ আল-তাবয়িয়ী লি আল-আদব) প্রতিষ্ঠার নির্দেশ পান। ফলে প্রজাতি অনুসারে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের শ্রেণী বিন্যাসের উদ্দেশ্যে তাঁরা জীবতত্ত্বের প্রতি পদার্থ-বিজ্ঞানীদের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। একথা সত্য যে প্রতিটি বস্তু বা প্রাণীবর্গের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অপরাপর বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক। সুতরাং সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সকল সাহিত্যিককে বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্গে সাজানো উচিত। কোন কোন সমালোচক তাঁদের মধ্যে জাতি, পরিবেশ এবং সময়কে প্রয়োগ করেন। আবার কেউ কেউ জৈব জগতের ক্রমবিকাশ এবং ১৪/২০ শতাব্দীর সূচনা অবধি ডারউইনের "বিবর্তনবাদ"কে এই বিশ্বজগতের প্রতি প্রয়োগ করেন। এভাবে বর্তমান শতাব্দীতে মানবজাতি সম্পর্কে অধ্যয়ন অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক গবেষণার ব্যাপক উন্নতি হয়। এই সব গবেষণার আলোকে এ শতাব্দীর সমালোচকগণ সমালোচনার ক্ষেত্রে কিছু নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। উল্লেখ্য যে, এসব নতুন তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের

উপর লিখিত পুস্তক থেকে পাওয়া এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাচীন জাতি থেকে প্রাপ্ত। এছাড়াও সমালোচনার নতুন মতবাদগুলো আরো ব্যাপক হারে উৎপত্তি লাভ করেছে। এসব তত্ত্ব স্বতন্ত্র এবং সম্মিলিত অবচেতনা-মূলক মতবাদের উপর লিখিত পুস্তক থেকে পাওয়া ও জাতির বন্ধন ও সংযমের উপর ভিত্তি করে এবং সম্প্রদায়ের কল্পনা এবং গল্পের অনুশীলন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান শতাব্দীর এক দল সমালোচক আরো বিশ্বাস করেন যে সমালোচনা একটি শিল্প, বিজ্ঞান নয়। তাঁরা আরো বলেন যে, সাহিত্য রুচি এবং ব্যক্তিগত অনুভূতি ব্যতীত সমালোচনার ভিত্তি বা উৎস আর কিছুই নয়।[৬৫]

ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরব বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে প্রাচীন ও আধুনিক আরবী সাহিত্য ও সমালোচনা শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি অধিক আগ্রহ দেখা দিয়েছে। আরবী সাহিত্য ও সমা-লোচনা শিক্ষা প্রদানে, গবেষণার উৎসাহ দানে এবং তুলনামূলক বিশ্ব সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সমালোচনার উপর অনেক আরবী পত্রিকা, সাময়িকী এবং গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব রচনায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের সাহিত্য আন্দোলনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে আরব ও অনারব ছাত্রদের জন্য বিশ্বের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবী সাহিত্য, আরবী-ভাষাতত্ত্ব, তুলনামূলক সাহিত্য এবং সমা-লোচনা অধ্যয়নের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। মিশরে মুহাম্মদ আলীর (১২২০/১৮০৫-১২৬৪/১৮৪৮) সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ফুটে উঠে শিক্ষার প্রতি তাঁর কৌতূহল এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানগুলোকে আরবীতে অনুবাদের মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপে বিশেষ করে ফ্রান্সে বিভিন্ন মিশন প্রেরণ করেন। রেনেসাঁ যুগে নবউন্নয়ন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ করে যোগাযোগের ফলে কিছু সংখ্যক সাহিত্যতত্ত্ব ও কলাশিল্প (Funun : geners or styles) আত্মপ্রকাশ করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে—উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, থিয়েটার, ভ্রমণ কাহিনী, আত্মচরিত, সমালোচনা, বর্ণনামূলক ও প্রণয়মূলক কবিতা, রাজনৈতিক বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা এবং সাংবাদি-কতা। কিছু সংখ্যক আরবী নাটক, উপন্যাস এবং কবিতা এখন ফরাসী, জার্মানী, চীনা, ইংরেজী, রুশ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষায় তুলনামূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোচিত হয়।[৬৬]

তথ্যনির্দেশ

১ তু. আহমাদ আমীন, আল-নাক্দ আল-আদাবী (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরাবী, ১৩৮৭/১৯৬৭), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮-৩৭; আহ্মাদ আল-শাইব, উসূল আল-নাক্দ আল-আদাবী (কায়রো: মাকতাবা আল-নাহদা আল-মিসরিয়্যা, ১৯৭৩), পৃ. ১১৪-১৮; M. H. Bakalla, *Arabic Culture* (London : Kegan paul International Ltd., 1984), পৃ. ২৬০

২ তু. আহ্মাদ আমীন, আল-নাকদ আল-আদাবী, পৃ. ৮

৩ তু. আহ্মাদ আল-শাইব, উসূল আল-নাক্দ আল-আদাবী, পৃ. ৫১-৫২; ঐ, আল-উসলূব: দিরাসাত বালাগিয়্যা তাহ্লীলিয়্যা লি উসূল আল-আসালীব আল-আদাবিয়্যা (কায়রো: আল্-নাহ্দা আল-মিসরিয়্যা, ১৯৫৬), পৃ. ১ ও পরবর্তী পৃ.; ত্বাহা আহ্মাদ ইব্রাহীম, তারীখ আল-নাক্দ আল-আদাবী ইন্দা আল-আরব (কায়রো: দার আল-হিকমা, ১৯৭২), ভূমিকা, পৃ. ৯-১৪; M. H. Bakalla, Arabic Culture, পৃ. ১১৩; J. Heworth-Dunne, "Printing and Translation under Muhammad Ali of Egypt : The Foundation of Modern Arabic," Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1940), পৃ. ৩২৫-৩৯।

৪ cf. Taha Husayn, *Muhadarat fi Tarikh al-Balagha* and his introduction to *Naqd al-Nathr*; ড. মুহাম্মদ গোনাইমী হিলাল, আল-নাক্দ আল-আদাবী আল-হাদীস (কায়রো: দার নাহ্দা মিসর, ১৯৭৯), পৃ. ২২৬-৪০

৫ ঐ; তু. উমর আল-দাসূকী, ফী আল-আদব আল-হাদীস (কায়রো দার আল-ফিকর, ১৯৭৩), ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪-২৫

৬ cf. M. A. Muid Khan, "Origin and Development of Arabic Literary Criticism," *Bulletin of the Institute of Islamic Studies* (Aligarh : University press, 1962-63), Nos. 6-7, পৃ. ৫৮-৭১; শাওকী দায়ফ, আল-বালাগাত তাতাওওর ওয়া তারীখ (কায়রো: দার আল-মাআরিফ, ১৯৭৭), পৃ. ১২০—২১৯

৭ সোলোন এথেন্সের একজন প্রখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৫৫৮ সালে মারা যান।

৮ তু. আহ্মাদ আল-শাইব, উসূল আল-নাক্দ আল-আদাবী (কায়রো: নাহ্দা আরবিয়্যা প্রেস, ১৯৭৩), পৃ. ১০৬-১৪

৯ তু. আহ্মাদ আল-শাইব, উসূল আল-নাক্দ আল-আদাবী, পৃ. ১০৬-০৭

১০ ঐ, পৃ. ১০৮; আরবী সমালোচনায় অলংকার শাস্ত্রের অভি-গমনের মূল্যায়ন সম্পর্কে দেখুন, মুহাম্মদ গোনাইমী হিলাল, আল-নাক্দ আল-আদাবী আল-হাদীস (কায়রো: দার নাহ্দা মিস্র, ১৯৭৯), পৃ. ২২৬-৪০

১১ ঐ, পৃ. ১০৮

১২ ঐ, পৃ. ১০৮

১৩ ঐ, পৃ. ১০৮

১৪ ঐ, পৃ. ১০৯

১৫ ঐ, পৃ. ১০৬-০৭

১৬ cf. M. H. Bakalla, *Arabic Culture*, পৃ. ২৬০; আহ্মাদ আল-শাইব, উসূল আল-নাক্দ আল-আদাবী, পৃ. ১০৬-০৯

১৭ তু. উমদাত আল-আদীব (দামেশ্ক: মাকতাবা আল-নাশ্র আল-আরবী, পৃ. ৬০

১৮ ঐ, পৃ. ৬০

১৯ তু. আহমাদ আল-শাইব, উসূল আল-নাক্দ আল-আদাবী, পৃ. ১০৯-১০

২০ তু. আহ্মাদ আমীন, আল-নাক্দ আল-আদাবী, পৃ. ৪৪৫-৪৯

২১ cf. M. H. Bakalla, *Arabic Culture*, পৃ. ২৬০-৬১; আহ্মাদ আল-শাইব, উসূল আল-নাক্দ আল-আদাবী, পৃ. ১১০

২২ তু. ইব্ন কুতায়বা, আল-শির ওয়া আল-শুআরা (কায়রো, ১৯৩২), পৃ. ৪৪

২৩ cf. M. H. Bakalla, *Arabic Culture*, পৃ. ১৩৮-৪০, ২৬১

২৪ ঐ, পৃ. ১৪১; আহ্মাদ আমীন, আল-নাক্দ আল-আদাবী, পৃ. ৪৫৭-৫৯

২৫ তু. ইব্ন কুতায়বা, আল-শি'র ওয়া আল-শুআরা, পৃ. ১২

২৬ তু. আহ্মাদ আল-শাইব, উসূল আল-নাক্দ আল-আদাবী, পৃ. ১১০

২৭ তু. আহ্মাদ আমীন, আল-নাক্দ আল-আদাবী, পৃ. ৪৫০-৬৯

২৮ ঐ, পৃ. ৪৬৮

২৯ তু. আহমাদ আল-শাইব, উসূল আল-নাক্দ আল-আদাবী, পৃ. ১১০

৩০ তু. আহ্মাদ আমীন, আল-নাক্দ আল-আদাবী, পৃ. ৪৬৩

৩১ cf. M. H. Bakalla, *Arabic Culture*, পৃ. ২৬১

৩২ ঐ, পৃ. ২৬১

৩৩ ঐ, পৃ. ২৬১-৬২

৩৪ আব্দ আল-হামীদ আল-আব্বাদী নাক্দ আল-নাছর-এর একটি পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান ইসকুরিয়াল গ্রন্থাগারে পান যা কুদামা বিন্ জাফর কর্তৃক রচিত বলে ধরা হয়। আল-আব্বাদী ১৩৫১/১৯৩৩ সালে ত্বাহা হুসাইনের সহযোগিতায় পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা করেন। ত্বাহা হুসাইন নিজেই গ্রন্থটিতে একটি সমা-লোচনামূলক ভূমিকা সংযোজন করেন। অভ্যন্তরীণ প্রমাণা-দির উপর ভিত্তি করে তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হন যে, নাক্দ আল-নাছর কিছুতেই কুদামা কর্তৃক রচিত নয়। ১৯৪৮ সালে চেস্টার বেটী গ্রন্থাগারে সংগৃহীত অপর একটি পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় যে, গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে আল-বুরহান ফী ওজুহ্ আল-বায়ান নামক অপর একটি পুস্তকের প্রথমাংশ যা আবূ আল-হুসাইন ইসহাক বিন্ ইব্রাহীম বিন্ সুলায়মান বিন ওয়াহাব আল-খাতীব কর্তৃক রচিত। cf. Pierre Cachia *Taha Husayn* (London : Luzac & Co.Ltd., 1956), পৃ. ১৪৩-৪৪; ড. আলী হাসান আব্দ আল-কাদির, "কিতাব আল-বুরহান ফী ওজুহ্ আল-বায়ান," আল-রিসালা, ১৬ খণ্ড (নভেম্বর ৮, ১৯৪৮), পৃ. ১২৫৭-৬০; কুদামা বিন্ জাফর, নাক্দ আল-নাছর, সম্পাদনা ত্বাহা হুসাইন ও আব্দ আল-হামীদ আল-আব্বাদী (কায়রো : দার আল-কুতুব প্রকাশনা, ১৩৫১/১৯৩৩), ভূমিকা, পৃ. ৫-৪৩

৩৫ cf. M. Z. al-Asmawi, "Arab Contribution to Literary Criticism, *Bulletin of the Faculty of Arts*, University of Alexandria Press (Egypt, 1960), ১৪ খণ্ড, পৃ. ৫১-৬৮

৩৬ cf. M. H. Bakalla, *Arabic Culture*, পৃ. ২৬২

৩৭ ঐ, পৃ. ২৬২-৬৩; cf. Abu Dib Kamal, *al-Jurjani's Theory of Poetic Imagery* : Approaches to Arabic Literature (London : Warminister, Wilts, 1979), No. 1.

৩৮ cf. M. H. Bakalla, *Arabic Culture*, পৃ. ২৬৩

৩৯ cf. George Kanazi, "Abu Hilal al-'Askari's attitude towards Poetry and poets, "*Journal of Semitic Studies* (Manchester, 1975), ২০ খণ্ড, পৃ. ৭৩-৮০

৪০ cf. al-Ashmawi, "Arab Contribution to Literary Criticism" *Bulletin of the Faculty of Arts*, Alexandria University Press, (Egypt 1960), ১৪ খণ্ড, পৃ. ৫৯)

৪১ cf. Dr. Abu Baker Siddique, "Yatimat al-Dahr and Thaalibi's Methods of Criticism : A review," *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* (1986), ৩১ খণ্ড, নং ১, পৃ. ৯৭-১২৭

৪২ ঐ

৪৩ ঐ, পৃ. ১০৬-০৭; তু. আহ্মাদ আল-শাইব, উসূল আল-নাক্দ আল-আদাবী, পৃ. ১১২

৪৪ তু. আহমাদ আল্-শাইব, উসূল আল-নাক্দ আল-আদাবী, পৃ. ১১১-১২; ত্বাহা আহ্মাদ ইব্রাহীম, তারীখ আল-নাক্দ আল-আদাবী ইনদা আল-আরব (মিসর : দার আল-হিকমা, ১৯৭২), পৃ. ১৩৬

৪৫ cf. M. H. Bakalla, *Arabic Culture*, পৃ. ২৬৪

৪৬ তু. ইব্‌ন খালদূন, আরবী কাব্যতত্ত্ব, আবু রুশদ (অনূদিত), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪), পৃ. ২-৪

৪৭ cf. M. H. Bakalla, *Arabic Culture*, পৃ. ২৬৩-৬৪ ; al-Ashmawi, M. Z., "Arab Contribution to Literary Criticism, *Bulletin of the Faculty of Arts* (Alexandria University, Egypt, 1960), ১৪ খণ্ড, পৃ. ৫১-৬৮

৪৮ ১৯২৪ সালে সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনে পরাবাস্তববাদ আন্দোলন শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল আপাত বাস্তবতার বাইরে কোন গূঢ় বাস্তবতার সন্ধান। লত্রেঁমো, র‍্যাবোঁ, ম্যালার্মে এবং জারি এই আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন।

৪৯ cf. M. H. Bakalla, *Arabic Culture*, পৃ. ১৯২-৯৬

৫০ ঐ

৫১ ঐ

৫২ cf. P. Cachia, *Taha Husayn*, পৃ. ১৩৫

৫৩ ঐ

৫৪ ঐ, পৃ. ৩৬

৫৫ ঐ

৫৬ ঐ, পৃ. ১৩৯-৪২

৫৭ ঐ, পৃ. ১৪০

৫৮ ঐ, পৃ. ১৪৩-৪৪

৫৯ ঐ, পৃ. ১৫১

৬০ ঐ, পৃ. ১৬৭

৬১ ঐ, পৃ. ১৫২

৬২ ঐ

৬৩ ঐ

৬৪ cf. Khalafallah Muhammad, "Some landmarks of Arab achievements in the field of Literary criticism," *Bulletin of the Faculty of Arts*, Alexandria University press (Egypt, 1961), ১৫ খণ্ড, পৃ. ৩-১৯

৬৫ তু. শাওকী দায়ফ, ফী আল-নাক্‌দ আল-আদাবী, (কায়রো : দার আল-মাআরিফ , (১৯৮১), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ৫-৬ ; প্রাগুক্ত, ফুসূল ফী আল-শি'র ওয়া নাক্‌দিহি (কায়রো : দার আল-মাআরিফ, ১৯৭৭), ২য় সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ৫-৮ ; প্রাগুক্ত, দিরাসাত ফী শি'র আরাবী আল-মুআসির (কায়রো : দার আল-মাআরিফ, ১৯৭৯), ৭ম সংস্করণ, পৃ. ৫-৮

৬৬ cf. J. Heworth-Dunne, "Printing and Translations under Muhammad Ali of Egypt," *JRAS* (1940), পৃ. ৩২৫-৩৯